স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

রাজযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

০. ভূমিকা..... 2
১. অবতরণিকা (প্রথম অধ্যায়)..... 5
২. সাধনার প্রথম সোপান (দ্বিতীয় অধ্যায়) 1 9
৩. প্রাণ (তৃতীয় অধ্যায়) 3 1
৪. প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ (চতুর্থ অধ্যায়)..... 4 7
৫. অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম (পঞ্চম অধ্যায়) 5 4
৬. প্রত্যাহার ও ধারণা (ষষ্ঠ অধ্যায়)..... 6 0
৭. ধ্যান ও সমাধি (সপ্তম অধ্যায়) 6 9
৮. সংক্ষেপে রাজযোগ (অষ্টম অধ্যায়)..... 8 0

০. ভূমিকা

ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে মনুষ্যসমাজ বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান কালেও যে-সকল সমাজ আধুনিক পূর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী মানুষের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকংশই বিশ্বাসের অযোগ্য, কারন যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই-সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতারক। অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত অলৌকিক ঘটনাগুলি অনুকরণমাত্র। কিন্তু ঐগুলি কিসের অনুকরণ? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া অকপট বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নয়। যাহারা ভাসাভাসা বৈজ্ঞানিক, তাহারা মনোরাজ্যের নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার-পরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া সেগুলির অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব যে-সকল ব্যক্তির বিশ্বাস-মেঘলোকের উর্ধ্বে কোন পুরুষবিশেষ অথবা দেবতাগণ তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহাদের অপেক্ষা পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ অধিকতর দোষী। কারণ শেষোক্তেরা বরং অজ্ঞতা বা বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর দোহাই দিতে পারে, এই শিক্ষা তাহাদিগকে এইরূপ দেবতাদের উপর নির্ভর করিতে শিখাইয়াছে, এই নির্ভরতা এখন তাহাদের অবনত স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যক্তদিগের দোহাই দিবার কিছুই নাই।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়াছে এবং পরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব বাহির করিয়াছে; এমন কি মানুষের ধর্মপ্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্যন্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজযোগ-রূপ বিজ্ঞান। যে-সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা দুরূহ, কতকগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অমার্জনীয় ধারা অবলম্বন করিয়া রাজযোগ সেগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, বরং

ধীরভাবে অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে বলে যে অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি-এগুলি যদিও সত্য, কিন্তু মেঘের ওপারে অবস্থিত কোন দেবতা দ্বারা এ-সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়-এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। রাজযোগ সমগ্র মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহা আরও শিক্ষা দেয়, সমস্ত অভাব ও বাসনা যেমন মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, তেমনি মানুষের ভিতরেই ঐ অভাব মোচন করিবার শক্তিও রহিয়াছে; যখন সেখানে কোন বাসনা,অভাব বা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে এই অনন্ত শক্তি-ভান্ডার হইতেই এই সব প্রার্থনা পূর্ণ হইতেছে, কোন অলৌকিক পুরুষের দ্বারা নয়।

অপ্রাকৃত পুরুষের ধারণা মানুষের ক্রিয়াশক্তি কিছু পরিমাণে জাগ্রত করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়া থাকে। ইহার ফলে স্বাধীনতা চলিয়া যায়, ভয় ও কুসংস্কার আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, ঐভাবে শেষ পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় যে-মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল। যোগী বলেন, অতিপ্রাকৃত বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্মকে সেরূপ করা যায় না। রাজযোগ অভ্যাস করিলে সূক্ষ্মতর অনুভূতি অর্জিত হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে যত বেদানুগ দর্শনশাস্ত্র আছে, তাহাদের সকলেরই এক লক্ষ্য-পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি। ইহার উপায় যোগ। ‘যোগ’ শব্দ বহুব্যাপক। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন-না-কোন আকারে যোগের সমর্থন করে।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ‘রাজযোগ’ নামে পরিচিত যোগ। রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ ‘পাতঞ্জলসূত্র’। কোন কোন দার্শনিক বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ সকলেই কার্যক্ষেত্রে একবাক্যে তাঁহার সাধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউ ইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিবার জন্য যে-সকল বক্তৃতা দেন, সেইগুলি গ্রথিত হইল। দ্বিতীয়াংশে পতঞ্জলির সূত্রগুলির ভাবানুবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যতদূর সাধ্য, পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করিবার ও কথোপকথনের সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমাংশে সাধনার্থিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের সকলকেহ বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত, নিরাপদে যোগশিক্ষা করিতে হইলে গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকা আবশ্যক। যদি কথাবার্তার ছলে প্রদত্ত এই-সকল উপদেশ লোকের মনে এই-সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা উদ্রেক করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে গুরুর অভাব হইবে না।

পাতঞ্জল-দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই দুই মতে প্রভেদ অতি সামান্য। দুটি প্রধান মত-বিভিন্নতা এইঃ প্রথমতঃ পতঞ্জলি আদিগুরু-স্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যেরা কেবল প্রায়-পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি-যাঁহার উপর সাময়িকভাবে কোন কল্পে জগতের শাসনভার প্রদত্ত হয়, এইরূপ অর্থাৎ জন্য-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ যোগীরা মনকে আত্মা বা ‘পুরুষ’-এর ন্যায় সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, সাংখ্যেরা তাহা করেন না।

১. অবতরণিকা (প্রথম অধ্যায়)

আমাদের সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আনুমানিক জ্ঞান, যেখানে সামান্য(general) হইতে সামান্যতর বা সামান্য হইতে বিশেষ(particular) জ্ঞানে উপনীত হই, তাহারও ভিত্তি-অভিজ্ঞতা। যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান১ বলে, সেগুলির সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে পারে, কারণ ঐগুলি প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা স্পর্শ করে। বৈজ্ঞানিক তোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না, তিনি নিজে কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; যখন তিনি আমাদিগকে তাঁহার সেই সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বাস করিতে বলেন, তখন তিনি কোন এক সর্বজনীন অনুভূতির নিকটই আবেদন জ্ঞাপন করেন। প্রত্যেক নিশ্চিত-বিজ্ঞানেরই(exact science) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহা হইতে লব্ধ সিদ্ধান্তসমূহ ঠিক না ভুল, তাহা আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি। এখন প্রশ্ন এই- ধর্মের এরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কিনা? ইহার উত্তরে আমাকে ‘হাঁ’ এবং ‘না’- দুই-ই বলিতে হইবে।

পৃথিবীতে সচরাচর যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হয়-ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টি মাত্র। এইজন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ করিতেছে। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; একজন বলিলেন, মেঘের উপরে এক মহান্ পুরুষ বসিয়া আছেন, তিনিই সমগ্র জগৎ শাসন করিতেছেন; বক্তা আমাকে তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই উহা বিশ্বাস করিতে বলেন। এইরূপ আমারও নিজস্ব ভাব থাকিতে পারে, আমি অপরকে তাহা বিশ্বাস করিতে বলিতেছি। যদি তাঁহারা কোন যুক্তি চান, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে পারি না। এইজন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রসঙ্গে অশ্রদ্ধা দেখা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলিতে চায়, ‘এই- সব ধর্ম তো দেখছি কতকগুলো মত মাত্র, এগুলোর সত্যাসত্য-বিচারের কোন মানদন্ড

নেই, যার যা খুশি সে তাই প্রচার করতে ব্যস্ত।' এসব সত্ত্বেও ধর্ম বিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে-উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণাসমূহের নিয়ামক। ঐগুলির ভিত্তি পর্যন্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. Exact Science-নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে-সব বিজ্ঞানের তত্ব এতদুর সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারা যায়। যথা-গণিত, গণিতজ্যোতিষ ইত্যাদি।

প্রথমতঃ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলির শাস্ত্র বা গ্রন্থ আছে, কতকগুলির তাহা নাই। যেগুলি শাস্ত্রের উপর স্থাপিত, সেগুলি সুদৃঢ়; উহাদের অনুগামীর সংখ্যাও অধিক। শাস্ত্র-ভিত্তিহীন ধর্মসকল প্রায়ই লুপ্ত, কতকগুলি নূতন হইয়াছে বটে, কিন্তু খুব কম লোকই ঐগুলির অনুগত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্রদায়েই মতের এই ঐক্য দেখা যায় যে, উহাদের শিক্ষা বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভজ্ঞতার ফলস্বরূপ। খ্রীষ্টান তাঁহার ধর্মে, যীশুখ্রীষ্টে ও তাঁহার অবতারত্বে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বে এবং আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতে বলিবেন। যদি আমি তাঁহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলিবেন-'ইহা আমার বিশ্বাস।' কিন্তু যদি তুমি খ্রীষ্টধর্মের মূল উৎসে গমন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহাও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর স্থাপিত। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 'আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।' তাঁহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেন, 'আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি।' এইরূপ আরও অনেকর কথা শুনা যায়।

বৌদ্ধধর্মেও এইরূপ; বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষানুভূতির উপর এই ধর্ম স্থাপিত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন সেই-সকল সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সেগুলিই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ; তাঁহাদের শাস্ত্রে ঋষি-নামধেয় গ্রন্থকর্তাগন বলিয়া গিয়াছেন, 'আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি।' তাঁহারা সেইগুলিই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা

গেল যে জগতে সকল ধর্মই জ্ঞানের সার্বভৌম ও সুদৃঢ় ভিত্তি-প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। সকল ধর্মাচার্যই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আত্মদর্শন করিয়াছিলেন; সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ দেখিয়াছিলেন-অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, প্রায় সকল ধর্মেই-বিশেষতঃ ইদানীং-একটি অদ্ভূত দাবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তাহা এইঃ বর্তমানে এই-সকল অনুভূতি অসম্ভব। যাঁহারা ধর্মের প্রথম স্থাপয়িতা, পরে যাঁহাদের নামে সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, শুধু এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব ছিল। আজকাল আর এরূপ অনুভূতি কাহারও হয় না, অতএব ধর্ম এখন বিশ্বাস করিয়াই লইতে হইবে-এ-কথা আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। যদি জগতে জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে কেহ কখন কোন একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্বেও কোটি কোটি বার ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, পরেও অনন্তকাল ধরিয়া বার বার ঐরূপ সম্ভাবনা থাকিবে। একরূপতাই প্রকৃতির কঠোর নিয়ম; একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে।

যোগ-বিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, 'ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং এই-সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহই ধার্মিক হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের দ্বারা এই-সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম 'যোগ' । '

ধর্ম যতদিন না অনুভূত হইতেছে, ততদিন ধর্মের কথা বলাই বৃথা। ভগবানের নামে এত গন্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদানুবাদ কেন? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; কারণ সাধারণ মানুষ ধর্মের মূল উৎসে যায় নাই। সকলই পূর্বপুরুষগণের কতকগুলি আচার অনুমোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা চাহিত, অপরেও তাহাই করুক। আত্মা অনুভূতি না করিয়া, আত্মা অথবা ঈশ্বর দর্শন না করিয়া 'ঈশ্বর আছেন' বলিবার কী অধিকার মানুষের আছে? যদি ঈশ্বর থাকেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুবা বিশ্বাস

না করাই ভাল। ভন্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল। এক দিকে আজকালকার 'বিদ্বান্' বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদের মনোভাব এই যে, ধর্ম, দর্শন ও পরমপুরুষের অনুসন্ধান-সবই নিষ্ফল। অপর দিকে যাঁহারা অর্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ বোধ হয় যে, ধর্ম-দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই, তবে ঐগুলির এই মাত্র উপযোগিতা যে, এগুলি জগতের মঙ্গল-সাধনের বলিষ্ঠ প্রেরণাশক্তি-যদি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বস করে, সে সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে এবং কর্তব্যনিষ্ঠ নাগরিক হয়। যাহাদের এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে দোষ দিতে পারি না; কারণ তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা পায়, তাহা অসংলগ্ন অন্তঃসারশুন্য প্রলাপ-বাক্যের মতো অনন্ত শব্দসমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বলা হয়। তাহারা কি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে মানব-প্রকৃতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিত না। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং সত্য অনুভব করিতে চায; সত্যকে ধারণা করিতে, সত্যকে সাক্ষাৎ করিতে, অন্তরের অনুভব করিতে চায়। 'কেবল তখনই সকল সন্দেহ চলিয়া যায়, সব তমোজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, সকল বক্রতা সরল হইয়া যায়'।১ বেদ এইরূপ ঘোষণা করেনঃ

'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম-নিবাসিগণ, শ্রবণ কর-আমি এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, যিনি সকল তমসার পারে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সেখানে যাওয়া যায়-মুক্তির আর কোন উপায় নাই।' ২

রাজযোগ-বিজ্ঞানের লক্ষ্য-এই সত্য লাভ করিবার প্রকৃত কার্যকর ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রনালী মানব-সমক্ষে স্থাপন করা। প্রথমতঃ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পর্যবেক্ষণ-প্রণালী আছে।

১। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।। মুন্ডক উপ, ২। ২। ৮
২। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্তা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।।শ্বেঃউঃ,২। ৫
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহরনায়।। শ্বেঃ উঃ,৩। ৮

তুমি যদি জ্যোতির্বিদ্ হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল 'জ্যোতিষ, জ্যোতিষ' বলিয়া চীৎকার কর, কখনই তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অধিকারী হইবে না। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ। এখানেও একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে; পরীক্ষাগারে (laboratory) গিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে; ঐগুলি মিশাইয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে হইবে, পরে ঐগুলি লইয়া পরীক্ষা করিলে তবে তুমি রসায়নবিৎ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্বিদ্ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গিয়া দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তবে তুমি জ্যোতির্বিদ্ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক-একটি নিদিষ্ট প্রণালী থাকা উচিত। আমি তোমাদিগকে শত সহস্র উপদেশ দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা কখনই ধার্মিক হইতে পারিবে না; সকল যুগে সকল দেশেই নিষ্কাম শুদ্ধ-স্বভাব জ্ঞানিগণ এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের হিতসাধন ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন কামনা ছিল না। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে যে সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমরা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি।' তাঁহারা সকলকে সেই সত্য পরীক্ষা করিতে আহ্বান করেন। তাঁহারা আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া আন্তরিক সাধন করিতে বলেন। এইভাবে সাধনা করিয়া যদি আমরা এই উচ্চতর সত্য লাভ না করি, তখন আমরা বলিতে পারি, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয়, তাহা যথার্থ নয়। কিন্তু তাহার পূর্বে এই-সকল উক্তির সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আমাদের নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইয়া নিষ্ঠাপূর্বক সাধন করিতে হইবে, আলোক নিশ্চয়ই আসিবে।

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা সামান্যীকরণের সাহায্য লইয়া থাকি; সামান্যীকরণ আবার পর্যবেক্ষনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে আমরা ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করি, শেষে তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা মূলনীতি উদ্ভাবন করি। যতক্ষণ না মনের ভিতর কি হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ

করিতে পারি, ততক্ষণ আমরা মন সম্বন্ধে, মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্য জগতের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ঐ উদ্দেশ্যে বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিতে সাহায্য করে, এমন কোন যন্ত্র আমাদের নাই। তথাপি আমরা নিশ্চয় জানি যে, কোন বিদ্যাকে প্রকৃত বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে হইলে পর্যবেক্ষণ আবশ্যক। বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়া ভিত্তিহীন অনুমানমাত্রে পর্যবসিত হয়। এই কারণেই যে অল্প কয়েক জন মনোবিৎ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছেন মাত্র।

রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়।

মনই ঐ পর্যবেক্ষণের যন্ত্র। আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত করিয়া অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত করিতে পারিলেই উহা মনকে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিবে, এবং তাহার আলোকে আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিব, আমাদের মনের মধ্যে কি ঘটিতেছে, মনের শক্তিসমূহ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিসদৃশ। উহারা কেন্দ্রীভূত হইলেই সব কিছু আলোকিত করে, ইহাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাহ্যজগতে, কি অন্তর্জগতে, সকলেই এই শক্তি ব্যবহার করিতেছে; তবে বৈজ্ঞানিক বহির্জগতে যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন, মনোবিৎকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক অভ্যাস প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতে আমরা কেবল বাহিরের বস্তুতেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাইয়াছি, অন্তর্জগতের বস্তুতে নয়। এই কারণে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অন্তর্যন্ত্রের পর্যবেক্ষণশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। মনকে অন্তর্মুখ করা, উহার বহির্মুখী গতি নিবারণ করা-যাহাতে মন নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, সেজন্য উহার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্য। কিন্তু এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইহাই একমাত্র উপায়।

এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা কি? প্রথমতঃ জ্ঞানই জ্ঞানের সর্বোচ্চ পুরস্কার। দ্বিতীয়তঃ ইহার উপকারিতাও আছে; ইহা সমস্ত দুঃখ দূর করিবে। যখন মানুষ নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন এক বস্তুর সাক্ষাৎ পায়, যাহার কোন কালে নাশ নাই-যাহা স্বরূপতঃ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যশুদ্ধ, তখন আর তাহার দুঃখ থাকে না, নিরানন্দ থাকে না। ভয় ও অপূর্ণ বাসনাই সকল দুঃখের কারণ। পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ করিলে মানুষ বুঝিতে পারিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আর মৃত্যুভয় থাকিবে না। নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলে অসার বাসনা আর থাকে না। পূর্বোক্ত কারণদ্বয়ের অভাব হইলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না, তৎপরিবর্তে এই দেহেই পরমানন্দ লাভ হইবে।

জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। রসায়নবিৎ নিজের পরীক্ষাগারে মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া-যে সকল বস্তু তিনি বিশ্লেষণ করিতেছেন, সেগুলির উপর প্রয়োগ করেন, এইরূপ ঐ-সকল রহস্য অবগত হন। জ্যোতির্বিদ্ নিজের মনের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাহা আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর অমনি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র-সকলেই নিজ নিজ রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে। আমি যে-বিষয়ে এখন তোমাদের নিকট বলিতেছি, সে-বিষয়ে আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে পারিব। তোমরা আমার কথা শুনিতেছ; তোমরাও যতই এ-বিষয়ে মনোবিবেশ করিবে, ততই আমার কথা স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে।

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই-সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করিতে জানিলে-কিভাবে আঘাত করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে বিশ্বপ্রকৃতি স্বীয় রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত।

সেই আঘাতের শক্তি ও তীব্রতা আসে একাগ্রতা হইতে। মনুষ্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই; উহা যতই একাগ্র হয় ততই উহার শক্তি একটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত হয় এবং ইহাই রহস্য।

মনকে বহির্বিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতই বহির্মুখ; ধর্ম, মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শনবিষয়ে মন স্থির করা সহজ নয়, কারণ এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও বিষয়) এক। এখানে জ্ঞানের বিষয় একটি অভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে জ্ঞানের বিষয়। মনকে পর্যবেক্ষণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। আমরা জানি, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যাহা দ্বারা উহা নিজের ভিতরটি দেখিতে পারে-উহাকে অন্তঃপর্যবেক্ষণশক্তি বলা হয়। আমি তোমাদের সহিত কথা কহিতেছি; আবার ঐ সময়েই আমি যেন আর একজন লোক-বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি এবং যাহা করিতেছি, তাহা জানিতেছি ও শুনিতেছি। একই সময়ে তুমি কাজ করিতেছ ও চিন্তা করিতেছ, আবার তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে-তুমি কি চিন্তা করিতেছ। মনের সমুদয় শক্তি একত্র করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত হইব, ইহাই প্রকৃত ধর্ম। তখনই আমরা অনুভব করিব-আত্মা আছে কিনা, জীবন ক্ষণস্থায়ী না অনন্তকালব্যাপী, বুঝিব-জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কিনা। সবই আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইবে। রাজযোগ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে চায়। রাজযোগের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য-কি ভাবে মনকে একাগ্র করা যায়, তারপর কি ভাবে মনের গভীরতম প্রদেশ আবিষ্কার করা যায়, শেষে মনের ভিতরের ভাবগুলি হইতে কিভাবে একটা সাধারণ ভাবে আসা যায় এবং তাহা হইতে নিজের একটা সিদ্ধান্ত করা যায়। এইজন্যই রাজযোগ জিজ্ঞাসা করে না, 'তোমার ধর্ম কি?'-তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, য়াহুদি হও, বৌদ্ধ হও অথবা খ্রীষ্টানই হও, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমরা মানুষ-ইহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মানুষেরই ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সকল বিষয় কারন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, আর নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তরও পাইতে পারে। তবে এজন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক।

তাহা হইলে এ-পর্যন্ত দেখিলাম, এই রাজযোগের আলোচনায় কোন প্রকার বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছ, ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না- রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেয়। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কিছুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। তোমরা কি বলিতে চাও যে জাগ্রত অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার সাহায্য আবশ্যক? কখনই নয়। এই রাজযোগ-সাধনে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন।

এই অভ্যাসের কিছু অংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক, কিন্তু ইহার অধিকাশই মনঃসংযমাত্মক। ক্রমশ আমরা বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি, মন শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ, আর মন শরীরের উপর কার্য করে, তাহা হইলে ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ এবং সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার মন উত্তেজিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হইলে শরীরও অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাহাদের মন অতি অল্প-বিকশিত। তোমরা যদি কিছু মনে না কর তবে বলি-অধিকাংশ মানুষ পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। শুধু তাই নয়, অনেক স্থলে ইতর প্রণী অপেক্ষা তাহাদের সংযম-শক্তি বড় বেশী নয়। মনের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বই নাই। মনের উপর এই ক্ষমতালাভের জন্য, শরীর ও মনকে বশীভূত করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের- দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবে, তখন মনকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার চেষ্টা করিতে পারি। এইরূপে মনকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে পারিব, ইচ্ছামত উহাকে দিয়া কাজ করাইতে পারিব এবং মনের শক্তিগুলি একাগ্র করিতে পারিব।

রাজযোগীদের মতে বহির্জগৎ অন্তর্জগতের বা সূক্ষ্মজগতের স্থূল রূপ মাত্র। সর্বত্রই সূক্ষ্ম কারণ ও স্থূল কার্য। অতএব এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য ও অন্তর্জগৎ কারণ। অনুরূপভাবে বহির্জগতের শক্তিগুলি অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূলভাগ মাত্র। যিনি এই অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি আবিষ্কার করিয়া ইচ্ছামত উহাদিগকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন।, সমগ্র

প্রকৃতি তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব করার-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজকেই যোগী নিজ কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় উপনিত হইতে চান, যেখানে আমরা যেগুলিকে 'প্রকৃতির নিয়মাবলী' বলি, সেগুলি তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না, সেই অবস্থায় তিনি ঐ-সব অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি আন্তর ও বাহ্য সমগ্র প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করিবেন। মনুস্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ-শুধু এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন একই সমাজের মধ্যে কেহ কেহ বাহ্যপ্রকৃতি, আবার কেহ অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চায়; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ্যপ্রকৃতি, কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করলেই সব বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিলেই সব বশীভূত করা হয়; কাহারও মতে বাহ্যপ্রকৃতি বশীভূত করিলে সবই বশীভূত করা হয়। এই দুইটি চিন্তাধারার শেষ পর্যন্ত যাইলে বুঝা যায়, উভয়ের সিদ্ধান্তই সত্য।; কারণ প্রকৃতিতে বাহ্য বা আন্তর বলিয়া কোন ভেদ নাই, ইহা কাল্পনিক বিভাগ মাত্র; এইরূপ বিভাগের অস্তিত্ব কখনও ছিল না।

বহির্বাদী বা অন্তর্বাদী যখন নিজ নিজ জ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছিবেন, তখন উভয়ে একই স্থানে উপনীত হইবেন। ঠিক যেমন পদার্থ-বিজ্ঞানী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া গেলে দেখিতে পান-বিজ্ঞান দর্শনে মিশায়া যাইতেছে, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন, যেগুলিকে তিনি মন ও জড় বলিতেছেন, সেগুলি আপাত প্রতীয়মান ভেদমাত্র-প্রকৃতপক্ষে সত্তা একই।

যাহা হইতে এই 'বহু' উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। রাজযোগীরা বলেন, 'আমরা প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিব, পরে উহার দ্বারাই বাহ্য ও আন্তর উভয প্রকৃতিকেই বশীভূত করিব।' প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়; তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয়ে কিছু চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা ভাবিত, যাঁহারা ইহা অভ্যাস করিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে ডাইনি, যাদুকর, ইত্যাদি অপবাদ দিয়া পোড়াইয়া অথবা অন্যরূপে মারিয়া ফেলা হইত। ভারতবর্ষে নানা কারণে ইহা এমন সব লোকের হাতে পড়ে, যাহারা এই বিদ্যার শতকরা নব্বই ভাগ নষ্ট করিয়া বাকী অংশটুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট তথাকথিত কতকগুলি শিক্ষক দেখা যাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ তবু কিছু জানিতেন, এই আধুনিক অধ্যাপকগণ কিছুই জানেন না।

এই-সব যোগ-প্রণালীতে গুহ্য ও অদ্ভুত যাহা কিছু আছে, তাহা বর্জন করিতে হইবে; যাহা কিছু বলপ্রদ, তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন ধর্মেও তেমনি-যাহা কিছু তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাগ কর। রহস্যস্পৃহাই মানব-মস্তিষ্ক দুর্বল করিয়া ফেলে। ইহারই জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান যোগশাস্ত্র প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চার হাজার বছরেরও আগে এই যোগ আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালীবদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে। আশ্চর্য এই যে, ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাঁহার ভ্রমও সেই পরিমাণে তত অধিক। লেখক যত প্রাচীন, তাঁহার লেখা ততই যুক্তিসঙ্গত। আধুনিক লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই নানা প্রকার রহস্যের কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপে যোগ অল্প কয়েকজনের হাতে গিয়া পড়িল, তাহারা ইহাকে গোপনীয় বিদ্যা করিয়া তুলিল এবং যুক্তিরূপ প্রকাশ্য দিবালোক আর ইহাতে পড়িতে দিল না।

প্রথমেই বলিতে চাই, আমি যাহা কিছু শিক্ষা দিই তাহার ভিতর গোপনীয় কিছুই নাই। সামান্য যাহা কিছু আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। যুক্তি দ্বারা ইহা যতদূর বুঝানো যায়, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষভাবে জানি না, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র যাহা বলে শুধু তাহাই বলিব। অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অন্যায়; নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তি খাটাইতে হইবে; সাধন করিয়া দেখিতে হইবে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে,তাহা সত্য কিনা।

অন্যান্য বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতে এই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাতে গোপন রহস্য কিছু নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই; ইহার মধ্যে যেটুকু সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা উচিত। এ-সকল সাধনা রহস্যাবৃত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিলে অনেক বিপদ হইতে পারে।

আরও অগ্রসর হইবার পূর্বে আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব; এই সাংখ্যদর্শনের ভিত্তির উপর রাজযোগ-বিদ্যা স্থাপিত। সাংখ্যদর্শনের মতে বিষয়-জ্ঞান এইভাবে হয়ঃ প্রথমতঃ বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট উহা প্রেরণ করে; বাহিরের শব্দ-রূপ প্রভৃতি বিষয়ের প্রভাব বহিরিন্দ্রিয়ের যন্ত্রসাহায্যে নিজ নিজ মস্তিষ্ককেন্দ্রে বা প্রকৃত ইন্দ্রিয়ে নীত হয়, ইন্দ্রিয়গণ মনের নিকট ও মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন এবং বিষয়ের অনুভূতি হয়। অতঃপর ঐগুলি যে-পথে আসিয়াছিল, পুরুষ সেই পথেই ঐগুলিকে কর্মেন্দ্রিয়ে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি জড়, তবে চক্ষুরাদি বাহ্য যন্ত্র অপেক্ষা মন সূক্ষ্মতর। মন যে উপাদানে নির্মিত, তাহা সূক্ষ্ম তন্মাত্রাও উৎপন্ন করে। ঐগুলি স্থূল হইলে জড়রস্তুর উৎপত্তি হয়। ইহাই সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান। সুতরাং বুদ্ধি ও স্থূলভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার যন্ত্রবিশেষ। উহা দ্বারা আত্মা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সদা পরিবর্তনশীল, সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, সিদ্ধ অবস্থায় মন কখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিতে লগ্ন, কখন বা একটিতে, আবার কখন বা কোন ইন্দ্রিয়েই সংলগ্ন থাকে না। মনে কর, আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি; এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইব না; ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মন যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, তখন দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিল না। কিন্তু সিদ্ধপুরুষের মন একই সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের আবার অন্তর্দৃষ্টি আছে, এই শক্তিবলে মানুষ নিজ অন্তরের গভীরতম প্রদেশ দেখিতে পারে। এই অন্তর্দৃষ্টির শক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য; মনের সমুদয় শক্তিকে একাগ্র করিয়া, ভিতরের দিকে ফিরাইয়া ভিতরে কি হইতেছে, তাহাই তিনি জানিতে চান। ইহাতে নিছক বিশ্বাসের কোন কথা নাই, ইহা কোন

কোন দার্শনিকের মনস্তত্ব-বিশ্লেষণের ফলমাত্র। আধুনিক শরীরতত্ত্ববিৎ পন্ডিতেরা বলেন, প্রকৃত দর্শনের ইন্দ্রিয় চক্ষু নয়, উহা মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ু-কেন্দ্রে অবস্থিত। সমুদয় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন-মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্মিত, এই কেন্দ্রগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্মিত। সাংখ্যেরাও এই কথাই বলিয়া থাকেন; তবে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়া, আর বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ভৌতিক দিক দিয়া। তাহা হইলেও উভয়ের কথা এক। আমাদের গবেষণার রাজ্য ইহাকে অতিক্রম করিয়া।

যোগী এমন সূক্ষ্মনুভূতির অবস্থা লাভ করিতে চান, যাহাতে তিনি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঐগুলির মানস অনুভূতি অবশ্যই সম্ভব। বিষয়সমূহ কর্তৃক বহিরিন্দ্রিয়ে উৎপন্ন বেদন কিরূপে স্নায়ুমার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহারা আবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়-এই সমুদয় ব্যাপারগুলি অনুভব করা যায়। সকল বিষয় শিক্ষারই কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কিন্তু প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, উহার নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, তবে উক্ত বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবে; রাজযোগ সম্বন্ধেও সেইরূপ।

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক। যাহাতে মন খুব পবিত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। কোন পশুশালার ভিতরে গিয়া দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারা যায় আহারের সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ। হস্তী অতি বৃহদাকার জন্তু, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত; আর সিংহ বা বাঘের খাঁচার দিকে গিয়া দেখিবে-তাহারা অস্থির, চঞ্চল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, সবগুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, ইহা আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। যদি উপবাস করিতে আরম্ভ কর, প্রথমতঃ তোমার শরীর দুর্বল হইয়া যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলি হ্রাস পাইবে, কয়েকদিন পরে মানসিক শক্তিগুলিও হ্রাস পাইতে থাকিবে। তারপর স্মৃতিশক্তি চলিয়া যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে না, যুক্তিবিচার করা তো দূরের কথা। সেইজন্য সাধনার

প্রথমাবস্থায় খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে যখন আমাদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, যখন আমরা সাধনায় বেশ অগ্রসর হইয়াছি, তখন ঐ বিষয় আর তত সাবধানতার প্রয়োজন নাই। চারা গাছ যতদিন বাড়িতে থাকে, ততদিন উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, পাছে কেহ উহার ক্ষতি করে; গাছ বড় হইয়া গেলে বেড়া সরাইয়া লইতে হয়, তখন সমুদয় আক্রমণ অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার মতো যথেষ্ট শক্তি উহার হইয়াছে।

যোগী অধিক বিলাস ও কঠোরতা-দুই-ই পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অত্যধিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। গীতিকার বলেন, যিনি নিজেকে অনর্থক ক্লেশ দেন তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না। অতিভোজনকারী, একান্ত উপবাসী, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্মপরায়ন, অথবা একেবারে নিষ্কর্মা-ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না।

২. সাধনার প্রথম সোপান (দ্বিতীয় অধ্যায়)

রাজযোগ অষ্টাঙ্গযুক্ত। ১ম-যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ। ২য়-নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অধ্যাত্মশাস্ত্রপাঠ) ও ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বর-প্রনিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। তয়-আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী। ৪র্থ-প্রাণায়াম। ৫ম-প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরাইয়া উহাকে অন্তর্মুখী করা। ৬ষ্ট-ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা। ৭ম-ধ্যান। ৮ম-সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানতীত অবস্থা।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, যম ও নিয়ম চরিত্রগঠনের সাধন; ইহাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাঁহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। এগুলির অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না। যোগী কায়মনোবাক্যে কাহারও প্রতি কখনও অনিষ্টভাব পোষণ করিবেন না। করুণার ভাব কেবল মনুষ্যজাতিতেই আবদ্ধ থাকিবে না, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়া সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে।

পরবর্তী সোপান ‘আসন’। যতদিন না কিছুটা উচ্চ অবস্থা লাভ হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া পর পর অভ্যাস করিতে হয়। অতএব দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, এমন একটি আসন অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহার যে আসনে বসিলে সুবিধা হয়, তিনি সেই আসন বাছিয়া লইবেন। একজনের পক্ষে একভাবে বসিয়া চিন্তা করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে হয়তো সেভাবে বসা কঠিন বোধ হইবে। পরে আমরা দেখিতে পাইব যে, যোগ-সাধনকালে শরীরের ভিতর নানাপ্রকার কার্য চলিতে থাকিবে। স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলির গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের মধ্যে

নূতন প্রকারের স্পন্দন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে; সমগ্র শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদন্ডের অভ্যন্তরে হইবে; সুতরাং আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদন্ডকে সহজভাবে রাখা আবশ্যক-ঠিক সোজা হইয়া বসিতে হইবে, আর বক্ষ গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে-দেহের সমুদয় ভারটি যেন পঞ্জরগুলির উপর পড়ে। বক্ষোদেশ কুঞ্চিত থাকিলে কোনরূপ উচ্চতর চিন্তা করা সম্ভব নয়, তাহা সহজেই দেখিতে পাইবে।

রাজযোগের এই অংশটি হঠযোগের সহিত কিছুটা মিলে। হঠযোগ কেবল স্থূলদেহ লইয়াই ব্যস্ত, ইহার উদ্দেশ্য কেবল স্থূলদেহকে সবল করা। হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়াগুলি অতি কঠিন। উহা একদিনে শিক্ষা করা যায় না। আর উহা দ্বারা শেষ পর্যন্ত বেশী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না।

এই-সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই ডলসার্ট ও অন্যান্য ব্যায়ামাচার্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির দ্বারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন আসনে স্থির রাখা যায়। এগুলিরও উদ্দেশ্য-দৈহিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক নয়। শরীরে এমন কোন পেশী নাই, যাহা মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না; হৃদযন্ত্র তাহার আদেশে রুদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে, শরীরের প্রত্যেক অংশই ঐ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে।

মানুষকে দীর্ঘজীবী করাই হঠযোগের উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যই মুখ্য ভাব ইহাই হঠযোগীদের একমাত্র লক্ষ্য। 'আমার যেন পীড়া না হয়'-ইহাই হঠযোগীর দৃঢ়সঙ্কল্প; তাঁহার পীড়া হয়ও না; তিনি দীর্ঘজীবী হন; শতবর্ষ জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে কিছুই নয়। দেড়শত বৎসর বয়সে তিনি পূর্ণ যুবা ও সতেজ থাকেন, তাঁহার একটি কেশও শুভ্র হয় না; কিন্তু এই পর্যন্তই। বটবৃক্ষও কখন কখন পাঁচ হাজার বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহা বটবৃক্ষই থাকিয়া যায়, তার বেশী কিছু নয়। দীর্ঘজীবি মানুষ একটি সুস্থকায় প্রাণী, এইমাত্র।

হঠযোগীদের দুই-একটি সাধারণ উপদেশ খুব উপকারী। শিরঃপীড়া হইলে শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকা দিয়া শীতল জলপান করিবে, তাহা হইলে সারা দিনই তোমার মস্তিষ্ক

বেশ পরিষ্কার ও শীতল থাকিবে, তোমার কখনই সর্দি লাগিবে না। নাসিকা দিয়া জল পান করা কিছু কঠিন নয়, অতি সহজ। নাসিকা জলের ভিতর ডুবাইয়া নাসা দিয়া জল টানিতে থাকো, গলার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ জল আপনা-আপনি ভিতরে যাইবে।

আসন সিদ্ধ হইলে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। রাজযোগের অন্তর্গত নয় বলিয়া অনেকে ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। কিন্তু যখন ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের ন্যায় প্রামাণিক ব্যক্তি ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমি মনে করি, ইহা উল্লেখ করা উচিত। আমি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ-বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিব-'প্রাণায়াম দ্বারা যে-মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্মে স্থির হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে। প্রথমে নাড়ী শুদ্ধি করিতে হয়, তবেই প্রাণায়াম করিবার শক্তি আসে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিন নাসাপুট ধারণ করিয়া বাম নাসা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহন করিতে হইবে, হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম না করিয়া বাম নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। অহোরাত্র চারি বার অর্থাৎ ঊষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে পূর্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পাঁচরার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ীশুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণায়ামে অধিকার হইবে।' ১

১ প্রাণায়াম-ক্ষয়িত-মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দিশ্যতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্তব্যম্। ততঃ প্রাণায়ামেহধিকারঃ। দক্ষিণ-নাসিকাপুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পুরয়েদ যথাশক্তি। ততোহনন্তরমুৎসৃজ্যৈবং দক্ষিণেন পুটেন সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ।

অভ্যাস একান্তই আবশ্যক। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ বসিয়া আমার কথা শুনিতে পারো। কিন্তু অভ্যাস না করিলে এক বিন্দুও অগ্রসর হইতে পারিবে না। সবই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষানুভূতি না হইলে এ-সকল তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেক বিঘ্ন আছে।

প্রথম বিঘ্ন ব্যাধিগ্রস্ত দেহ-শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, এইজন্যই শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। কিরূপ পানাহার করি, কাজকর্ম করি, এ-সকল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। শরীর সবল রাখিবার জন্য সর্বদা মনের শক্তি প্রয়োগ কর-'কৃশ্চান সায়েন্স' (Christian Science)১ মতাবলম্বীরা সাধারণতঃ যেরূপ করিয়া থাকে। ব্যস্, শরীরের জন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা উদ্দেশ্যসাধনের একটি উপায় মাত্র-ইহা যেন আমরা কখনও না ভূলি। যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য হইত, তবে তো আমরা পশুতুল্য হইতাম। পশুরা প্রায়ই অসুস্থ হয় না।

দ্বিতীয় বিঘ্ন-সন্দেহ। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, সে-সকল বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া থাকি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না; এই কারণে যোগশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও মাঝে মাঝে সন্দেহ করিয়া থাকেন। এই সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই সাধনবিষয়ে উৎসাহ বর্ধিত হয়। যোগশাস্ত্রের জনৈক টীকাকার বলিয়াছেন, 'যোগশাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যদি একটি অতি সামান্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাহাতেই সমগ্র যোগশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস হইবে।' উদাহরণস্বরূপ কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে, তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে; অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়তো তাহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এ-সকল ব্যাপার অতি অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। উদাহরণস্বরূপ যদি নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম কর, তবে অল্প দিনের মধ্যেই দিব্য সুগন্ধ

পুনর্দক্ষিণেন পুরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেৎ যথাশক্তি।
ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো বৈবমভ্যস্যতঃ সবনচতুষ্টরমপররাত্রে মধ্যাহ্নে পুর্বরাত্রেহর্ধরাত্রে চ পক্ষান্মাসাদ্বিশুদ্ধর্ভবতি।-শাঙ্করভাষ্য, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২। ৮

Christian Science-এই সম্প্রদায় মিসেস এডি (Mrs. Eddy) নামক এক আমেরিকান মহিলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার মতে জড় বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, উহা কেবল আমাদের মনের ভ্রমমাত্র। বিশ্বাস করিতে হইবে-আমাদের কোন রোগ নাই, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষনাৎ রোগমুক্ত হইব। ইহার Christian Science নাম হইবার কারণ এই যে, এই মতাবলম্বীরা বলেন, 'আমরা খ্রীষ্টের প্রকৃত পদানুসরণ করিতেছি। খ্রীষ্ট যে-সকল অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন আমরাও তাহাতে সমর্থ এবং বর্সপ্রকার দোষশুন্য জীবনযাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য।'

আঘ্রাণ করিতে পাইবে; তাহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই-সকল সিদ্ধির স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, এগুলি আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের সহায়-মাত্র। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই-সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য-একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মার মুক্তি। প্রকৃতিকে সম্পূর্নরূপে নিয়ন্ত্রিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা ছোট কোন আদর্শ আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিব, প্রকৃতির ক্রীতদাস হইব না। শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে; আর ইহাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে-শরীর আমার, আমি শরীরের নই।

এক দেবতা ও অসুর আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া এক জ্ঞানীর (ব্রহ্মার)১ নিকট গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বাস করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা যাহাকে অন্বেষন করিতেছ, তোমরাই সেই পুরুষ।' তাহারা ভাবিল, তবে দেহই 'আত্মা'। তখন তাহারা উভয়েই 'আমাদের যাহা পাইবার, তাহা পাইয়াছি' মনে করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারা স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'যাহা শিক্ষা করিবার তাহা সবই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এখন চল, পান ভোজন করি ও আনন্দে মত্ত হই-আমরাই সেই আত্মা; ইহা ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই।' অসুরের স্বভাব অজ্ঞানমেঘে আবৃত ছিল, সুতরাং সে আর

এ-বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না। নিজেকে আত্মা বা ঈশ্বর ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইল; 'আত্মা' বলিতে সে দেহই বুঝিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, 'আমি' অর্থে এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখো, সুন্দর বসনভূষণে সাজাও, সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ সম্ভোগ কর। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাঁহার প্রতীতি হইল, গুরুর উপদেশের অর্থ এরূপ নয়, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গুরুদেব, আপনার শিক্ষার তাৎপর্য কি এই যে, শরীরই আত্মা?-কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? দেখিতেছি, শরীরমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আত্মা তো মরিতে পারে না।' আচার্য বলিলেন, 'তুমি নিজে ইহার অর্থ উপলব্ধি কর; তুমিই সেই আত্মা।' তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে প্রাণ দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া বললিলেন, 'গুরুদেব, আপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়াছেন?' গুরু বলিলেন, 'স্বয়ং ইহার অর্থ নির্ণয় কর, তুমিই সেই।' সেই দেবতা ফিরিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

১ ইন্দ্রবিরোচন-সংবাদ-ছান্দোগ্য উপ.,(৮।৭।১৫) দ্রষ্টব্য।

তবে মনই 'আত্মা' হইবে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবার কখন বা অসদ্বৃত্তি উঠিতেছে; মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না। তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমার তো মনে হয় না-মনই আত্মা; আপনি কি ইহাই উপদেশ দিয়াছেন?' গুরু বলিলেন, 'না, তুমিই তাহা। তুমি নিজে উহা খুঁজিয়া বাহির কর।' দেবতা ফিরিয়া গেলেন; অবশেষে তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হইলঃ 'আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা; আমিই এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, জল গলাইতে পারে না; আমি অনাদি, অনন্ত, অচল, অস্পর্শ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ পুরুষ। আত্মা শরীর বা মন নয়; আত্মা এ সকলেরই

অতীত।' এইরূপে সেই দেবতার জ্ঞানোদয় হইল এবং তিনি আনন্দে তৃপ্ত হইলেন। কিন্তু অসুর-বেচারার সত্যলাভ হইল না কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল।

এই জগতে অনেক অসুরপ্রকৃতির লোক আছে; কিন্তু দেবতা যে একেবারেই নাই, তাহাও নয়। যদি কেহ বলে, 'এস, তোমাদিগকে এমন এক বিদ্যা শিখাইব, যাহাতে তোমাদের ইন্দ্রিয়সুখ অনন্তগুণে বর্ধিত হইবে, তাহা হইলে অগণিত লোক তাহার নিকট ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ বলেন, 'এস, তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষয় শিখাইব', তবে তাঁহার শ্রোতাই জুটিবে না। উচ্চ তত্ত্ব শুধু ধারণা করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়; সত্যলাভ করিবার জন্য অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্যা তো আরও বিরল। কিন্তু সংসারে আবার এমন কিছু লোক আছেন, যাঁহারা জানেন, শরীর হাজার বৎসর বাঁচাইয়া রাখা গেলেও চরমে সেই একই গতি। যে-সকল শক্তিতে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, সেগুলি অপসৃত হইলে দেহ থাকিবে না। এক মুহূর্তের জন্যও শরীরের পরিবর্তন নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। 'শরীর' আর কি? উহা কতকগুলি পরিবর্তনের পরম্পরা মাত্র। নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। 'যেমন তোমার সম্মুখে নদীর জলরাশি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিন্তু দেখিতে ঠিক পূর্বের মতোই। এই শরীরও সেইরূপ।' তথাপি শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক, কারণ শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শরীরই আমাদের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

বিশ্বজগতে এই মানবদেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে, এমন কি দেবাদি হইতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নাই। দেবতাদিগকেও আবার নামিয়া আসিতে হয় এবং মানবদেহের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। একমাত্র মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এ-বিষয়ে বঞ্চিত। য়াহুদি ও মুসলমানদিগের মতে-দেবদূত ও অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তারপর দেবদূতদের ডাকিয়া মানুষকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন;

ইব্লিশ ব্যতীত সকলেই প্রণাম করিয়াছিলেন, এই জন্য ঈশ্বর ইব্লিশকে অভিশাপ দিলেন; সে 'শয়তান' - এ পরিণত হইল।

এই রূপকের আবরণে একটি মহৎ সত্য লুকাইয়া আছে, জগতে মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম। পশ্বাদি নিম্নতর সৃষ্টি তমঃপ্রধান। পশুরা কোন উচ্চ তত্ত্ব ধারনা করিতে পারে না। দেবতারাও মনুষ্যজন্ম না লইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। এইরূপে মনুষ্যসমাজেও আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অনুকূল নয়, আবার একেবারে নিঃস্ব হইলেও উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতেই জগতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহন করিয়াছেন। এই স্তরেই বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য আছে।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাক। আমাদিগকে এবার 'প্রানায়াম' বা শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। দেখা যাক, মনের শক্তিগুলি একাগ্র করার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ? শ্বাসপ্রশ্বাস যেন এই দেহ-যন্ত্রের গতি-নিয়ামক মূল-চক্র(fly-wheel)। একটি বড় এঞ্জিনে দেখিতে পাইবে যে, একটি বৃহৎ চক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে সেই এঞ্জিনের অতি সূক্ষ্মতম যন্ত্রগুলি পর্যন্ত গতিশীল হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস সেই গতিনিয়ামক মূল-চক্র, উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন প্রকাশ শক্তি আবশ্যক, তাহা যোগাইতেছে এবং শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে।

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে সে রাজার অপ্রিয় পাত্র হওয়ায় রাজা তাঁহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের চূড়ায় একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল; মন্ত্রীও সেখানে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রতা ভার্যা ছিলেন, রজনীযোগে তিনি সেই দুর্গের সমীপে আসিয়া দুর্গশীর্ষস্থিত পতিকে বলিলেন, 'আমি কি উপায়ে আপনার সাহায্য করিতে পারি, বলিয়া দিন।' মন্ত্রী বলিলেন, 'আগামী কাল রাত্রে একটি লম্বা কাছি, এক গাছি শক্ত দড়ি, এক বান্ডিল সুতা, খানিকটা সূক্ষ্ম রেশমের সুতা, একটা গুবরে পোকা ও খানিকটা মধু আনিও।' তাঁহার সহধর্মিণী পতির এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। যাহা হউক তিনি পতির

আজ্ঞানুসারে প্রার্থিত দ্রব্যগুলি আনিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে রেশমের সূত্রটি দৃঢ়ভাবে গুবরে পোকার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া উহার শুঁড়ে একবিন্দু মধু মাখাইয়া, মাথাটি উপরের দিকে রাখিয়া উহাকে দুর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পতিব্রতা সমুদয় নির্দেশ পালন করিলেন। তখন সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ করিল। সম্মুখে মধুর আঘ্রাণ পাইয়া মধুলাভের আশায় সে ধীরে ধীরে দুর্গের শীর্ষদেশে উপনীত হইল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন, সেই সঙ্গে রেশমের সুতাটিও ধরিলেন, তারপর তাঁহার স্ত্রীকে রেশম-সূত্রের অপর প্রান্তে শক্ত সুতাটি জুড়িয়া দিতে বলিলেন। পরে শক্ত সুতা হস্তগত হইলে ঐ উপায়ে তিনি দড়ি ও অবশেষে মোটা কাছিটিও পাইলেন। বাকী কাজ সহজ। ঐ রজ্জুর সাহায্যে মন্ত্রী দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রেশম-সূত্রের মতো।

উহাকে ধারণ বা সংযম করিতে পারিলেই স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ-রূপ(nervous currents) শক্ত সুতা, তারপর মনোবৃত্তিরূপ শক্ত দাড়ি, পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরিতে পারা যায়। প্রানকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

আমরা নিজেদের শরীর- সম্বন্ধে কিছুই জানি না; কিছু জানিতে পারিও না। আমাদের সাধ্য এই পর্যন্ত যে, মৃতদেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে, আমরা দেখিতে পারি; কেহ আবার জীবিত প্রাণী লইয়া তাহার দেহব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার সহিত আমাদের নিজ নিজ শরীরের কোন সংস্রব নাই। আমরা নিজ শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি। জানি না কেন? ইহার কারণ আমাদের মন এত সূক্ষা নয় যে, আমাদের মধ্যে অতি সূক্ষা সূক্ষা যে-সব গতি রহিয়াছে, সেগুলি আমরা ধরিতে পারি। মন যখন আরই সূক্ষা হইয়া যেন দেহের গভীর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, তখনই আমরা ঐ গতিগুলি জানিতে পারি। এইরূপ সূক্ষা অনুভূতি লাভ করিতে হইলে প্রথমে স্থূল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সমগ্র শরীরযন্ত্রকে চালাইতেছে কে? উহা প্রাণ; শ্বাসপ্রশ্বাসই ঐ প্রাণশক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ। এখন শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতেই আমরা শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শক্তিগুলি

সম্বন্ধে জানিতে পারিব; জানিতে পারিব যে, স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহগুলি কিভাবে শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। আর যখনই আমরা ঐগুলি মনে মনে অনুভব করিতে পারিব, তখনই ঐগুলি এবং সেই সঙ্গে শরীরযন্ত্র আমাদের আয়ত্তে আসিতে থাকিবে। মনও এই-সকল স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, শেষ পর্যন্ত শরীর ও মন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে; উভয়েই আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া যায়। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি লাভ করিতে হইবে। সুতরাং শরীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর অভ্যন্তরে যে শক্তিপ্রবাহ সর্বদা চলিতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং আমাদিগকে প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে, অর্থৎ 'প্রাণায়াম' বা প্রাণের সংযম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। এই 'প্রাণায়াম' একটি দীর্ঘ বিষয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা প্রয়োজন। আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলোচনা করিব।

আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যে-সকল ক্রিয়া করা হয়, সেগুলির হেতু কি, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ায় দেহের মধ্যে কি কি শক্তির প্রবাহ চলিতে থাকে। ক্রমশঃ এ-সব আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু ইহাতে নিরন্তর অভ্যাসের সাধন আবশ্যক। সাধন দ্বারাই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। আমি এ-বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, এগুলি তোমাদের দ্বারা গৃহীত হইবে না, যতদিন না নিজেরা প্রত্যক্ষ করিবে। যে মুহূর্তে সারা দেহে এই-সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, তখনই সমুদয় সংশয় চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর অভ্যাস আবশ্যক।

প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার অভাস করিবে; আর ঐ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহ্ন। যখন রজনীর অবসান হইয়া দিবার প্রকাশ হয়, এবং দিবাবসান হইয়া রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করে। প্রত্যূষ ও গোধূলি, এই দুইটি প্রকৃতির শান্ত মুহূর্ত। এই দুই সময়ে শরীরও স্বভাবতঃ শান্ত হইতে চায়। এই দুই সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদিগকে অনেকটা সহায়তা করিবে, সুতরাং এই দুই সময়েই সাধন করা উচিত। সাধন সমাপ্ত না হইলে ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম

কর; এইরূপ নিয়ম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার আলস্য দূর করিয়া দিবে। স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার করিবে না, ভারতবর্ষে বালকদের এইরূপ শিক্ষাই দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে ইহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহাদের যতক্ষণ না স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ বালক ক্ষুধার্ত হয় না।

তোমাদের মধ্যে যাহাদের সুবিধা আছে, সাধনের জন্য তাহারা একটি স্বতন্ত্র ঘর রাখিতে পারো তো ভাল হয়। এই ঘর শয়নের জন্য ব্যবহার করিও না, ইহা পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিও না। এ-ঘরে সর্বদা পুষ্প রাখিবে; যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। সুন্দর চিত্রও রাখিতে পারো। প্রাতে ও সায়াহ্নে সেখানে ধূপ-ধুনা প্রজ্বলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে ক্রমে ঘরটি পবিত্রভাবে ভরিয়া উঠিবে। এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ বা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। ইহাই ছিল মন্দির গির্জা প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জায় এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া গিয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তা সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ন থাকে।

যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহারা যেখানে ইচ্ছা বসিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সোজাভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। সর্বপ্রথমে জগতে পবিত্র চিন্তার একটি স্রোত প্রবাহিত করিয়া দাও। মনে মনে বলো; ‘জগতে সকলেই সুখী হউক; সকলেই শান্তি লাভ করুক; সকলেই আনন্দ লাভ করুক।’১ এইরূপে পূর্বে, উত্তরে, দক্ষিণে পবিত্র চিন্তা প্রবাহিত কর। যতই এইরূপ করিবে, ততই তুমি নিজে ভাল বোধ করিবে। পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপরে সুস্থ থাকুক, এই ভাবনাই স্বাস্থ্য-লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউক-এইরূপ চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার সহজ উপায়।

তারপর যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করিবেন-অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য নয়, জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা করিবেন। ইহা ব্যতীত আর সব প্রার্থনাই স্বার্থমিশ্রিত। তারপর ভাবিতে হইবে-আমার দেহ দৃঢ়, সবল ও সুস্থ। এই দেহই আমার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র, শ্রেষ্ঠ সহায়। চিন্তা করিবে-ইহা বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। চিন্তা কর, এই শরীরের সাহায্যে এই জীবন-সমূদ্র উত্তীর্ণ হইব। দুর্বল ব্যক্তি কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। শরীরকে বলো-তুমি বলিষ্ঠ। মনকে বলো-তুমি শক্তিধর; এবং নিজের উপর অসীম বিশ্বাস ও ভরসা রাখো।

৩. প্রাণ (তৃতীয় অধ্যায়)

অনেকে মনে করেন, প্রাণায়াম শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন ব্যাপার, বাস্তবিক তাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি অল্পই। প্রকৃত প্রাণায়াম-সাধন করিতে হইলে অনেকগুলি ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া সেগুলির একটি। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমগ্র জগৎ দুইটি উপাদানে নির্মিত। তাহাদের মধ্যে একটির নাম 'আকাশ' । এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত সত্তা। যে-কোন বস্তুর আকার আছে, যে-কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই সূর্য, পৃথিবী, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়। সর্বপ্রাণীর শরীর-পশুশরীর, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যে-সকল রূপ আমরা দেখিতে পাই, যে-সকল বস্তু আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে-কোন বস্তু আছে, সে-সকলই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই; ইহা এত সূক্ষ্মা যে, ইহা সাধারণের অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন আকার ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকে। আবার কল্পান্তে সমুদয় কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থ-সবকিছুই আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়।

কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এইপ্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী উপাদান, প্রাণও সেইরূপ এই জগতের অনন্ত সর্বব্যাপী প্রকাশিকা শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সব বস্তুই আকাশে পরিণত হয়, জগতের সব শক্তিই আবার প্রাণে লয় পায়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সব শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই স্নায়ু-শক্তিপ্রবাহরূপে (nerve current),

চিন্তাশক্তিরূপে ও দৈহিক সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম শক্তি পর্যন্ত সবকিছুই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সকল শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাদের সমষ্টিকেই 'প্রাণ' বলে। যখন অস্তি বা নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তমঃ আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?১ এই আকাশই গতিশূন্য হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের গতি রুদ্ধ ছিল, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল।

১ নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীম্-ইত্যাদি
তম আসীৎ তমসা গুঢ়মগ্রে প্রকেত-ইত্যাদি। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০ম মণ্ডল

আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, ঐ শক্তিগুলি কল্পনান্তে শান্ত ভাব ধারণ করে-অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে, পরকল্পের আদিতে উহারাই আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর আঘাত করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে বিবিধ রূপ বিকশিত হয়; আরআকাশ পরিণামপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে এই প্রাণও নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা এবং উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ।

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের নিকট অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মনে কর, কোন ব্যাক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং উহাকে জয় করিতেও সক্ষম হইলেন, তাহা হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য-নক্ষত্র স্থানচ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য পর্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ শক্তিলাভ করা প্রাণায়াম-সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, তাঁহারা

তাঁহার আজ্ঞামাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন; মৃতব্যক্তিদিগকে আসিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সব শক্তিই ক্রীতদাসের মতো তাঁহার আদেশ পালন করে। অজ্ঞলোকেরা যোগীর এই-সকল কার্যকলাপ দেখিয়া বলে, এগুলি অলোকিক। হিন্দুমনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা যে-কোন তত্ত্ব আলোচনা করুক না কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যাহা কিছু খুঁটিনাটি আছে, সেগুলি রাখিয়া দেয় পরে মীমাংসার জন্য। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 'এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সবকিছু জানা যায়?'১ এইরূপে আমাদের সব শাস্ত্র, সব দর্শন-যে- বস্তুকে জানিলে সবকিছু জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। যদি কেহ জগতের তত্ত্ব একটু একটু করিয়া জানিতে চায়, তাহা হইলে তো অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে এক এক কণা বালুকাকে পর্যন্ত পৃথক্ ভাবে জানিতে হইবে। তথাপি সে সবকিছু জানিতে পারে না। তবে কিভাবে জ্ঞানলাভ সম্ভব? এক-একটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া মানুষের সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন, এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ ভাব রহিয়াছে। উহাকে ধরিতে পারিলেই সবকিছু আয়ত্ত করা যায়। এইভাবেই বেদে সমগ্র জগৎকে এক পূর্ণ সত্তায় পর্যবসিত করা হইয়াছে। যিনি এই 'সৎ'-স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমগ্র জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। এইভাবেই সমুদয় শক্তিকে এক প্রাণরূপ সাধারণ শক্তিতে পর্যবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যিনি 'প্রাণ'কে ধরিয়াছেন, তিনি জগতে যতকিছু মানসিক বা দৈহিক শক্তি আছে, সবকিছুকেই ধরিয়াছেন।

১ 'কস্মিন্নুভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?'-মুন্ডক উপ, ১।৩

যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুধু নিজের মন নয়, সকলের মন জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্যান্য যত দেহ আছে, সবই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রানই সমুদয় শক্তির মূল।

কিভাবে এই প্রান নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই প্রাণায়ামের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রাণায়ামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধকই-যে যেখানে আছে, সেখান হইতেই সাধন আরম্ভ করিবে, তাহার খুব নিকটে যাহা কিছু আছে, সবই জয় করিতে শিক্ষা করা উচিত। জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত, আবার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্বত্র ক্রিয়া করিতেছে, তাহার যে অংশ এই শরীর ও মন চালাইতেছে, সেই প্রাণটুকু আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্নিহিত। যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণসমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকরবর্তী তরঙ্গ। এই ক্ষুদ্র তরঙ্গ জয় করিতে পারিলে আমরা সমগ্র প্রাণসমুদ্র জয় করিবার আশা করিতে পারি। যে যোগী এ-বিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তিনি প্রায় সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ হন। আমরা প্রত্যেক দেশেই এরূপ কিছু কিছু সম্প্রদায় দেখিতে পাই, যাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দেশেই (আমেরিকায়) আমরা মনঃ-শক্তি দ্বারা আরোগ্যকারী (mind-healer), বিশ্বাসের দ্বারা আরোগ্যকারী (faith-healer), প্রেত-তত্ত্ববিৎ (spiritualist), ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্টিস্ট (Christian Scientist), সন্মোহন-বিদ্যাবিৎ (hypnotist) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে পাই। এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, এগুলির মূলে রহিয়াছে প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণ-তাহারা এ-কথা জানুক বা নাই জানুক। তাহাদের সব মতের মূলে একই জিনিস রহিয়াছে। তাহারা সকলে একই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, তবে অজ্ঞাতসারে-এইমাত্র। তাহারা হঠাৎ যেন একটি শক্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞাতসারেই উহা ব্যবহার করিতেছে। যোগী ঐ শক্তিরই পরিচালনা করেন। উহা প্রাণেরই শক্তি।

এই প্রাণই সকল প্রাণীর অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে রহিয়াছে। চিন্তাই প্রাণের সূক্ষাতম ও উচ্চতম ক্রিয়া; চিন্তার যতটুকু আমরা দেখিয়া থাকি, সেইটুকু উহার সব নয়। চিন্তার প্রকারভেদ আছে। সহজাত-জ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-শূন্য চিন্তাও আছে, তাহা আমাদের নিম্নতম কার্যক্ষেত্র। একটি মশক দংশন করিলে আমার হাত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

উহাকে আঘাত করিবে। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমার বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। ইহা চিন্তারই এক প্রকার অভিব্যক্তি। শরীরে জ্ঞান-সাহায্য-বিরহিত প্রতিক্রিয়া-মাত্রেই (Reflex action) চিন্তার এই স্তরের অন্তর্গত।

১ বাহিরের কোনরূপ উত্তেজনায় শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা না লইয়া আপনি কার্য করে. সেই কার্যকে reflex action বলে।

চিন্তার আর একটি স্তর আছে, উহাকে সজ্ঞান (Conscions) বলা যাইতে পারে। আমি যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিন্তা করি, কতকগুলি বিষয়ের দুইদিক আলোচনা করি, কিন্তু ইহাই শেষ নয়; আমরা জানি, যুক্তিবিচার সীমাবদ্ধ। যুক্তি আমাদিগকে কিছুদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, তারপর আর পারে না। যে স্থানটুকুর ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই, নানাবিধ বিষয় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া পড়িতেছে। ধূমকেতুর মতো কতকগুলি বিষয় কখন কখন ভিতরে আসিয়া পড়ে। ইহাও নিশ্চিত যে, অনেক তত্ত্ব ঐ সীমার বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্তু ঐ সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ঐ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গন্ডির ভিতর আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিতেছে, সেগুলির কারণ অবশ্য ঐ সীমার বাহিরে অবস্থিত; আমাদের বিচারযুক্তি সেখানে পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু যোগীর বলেন, ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা, তাহা কখনই হইতে পারে না। মন আরও উচ্চতর ভূমিতে-জ্ঞানাতীত ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। যখন মন সমাধি-নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থায় আরূঢ় হয়, তখন উহা যুক্তির সীমার বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শক্তিগুলি প্রাণেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি; ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ঐগুলি মনকে প্রেরণা দেয় এবং উচ্চতর অবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত ভূমিতে লইয়া যায়, এবং মন সেখান হইতে কার্য করিতে থাকে।

বিশ্বে অস্তিত্বের প্রত্যেক স্তরেই এক অখন্ড বস্তু রহিয়াছে। প্রাকৃতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই বিশ্বজগৎ এক ও অখন্ড। তোমার সহিত সূর্যের কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ একটি কল্পনা মাত্র।এই টেবিল ও আমার মধ্যে যথার্থ কোন ভেদ নাই। টেবিলটি অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দু, আর আমি উহার অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন এই অনন্ত জড়সাগরের এক-একটি আবর্ত। আবর্তগুলি আবার একটিও স্থির থাকে না। কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, প্রতিটি আবর্তে প্রতি মুহূর্তেই নূতন জলরাশি আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চলিয়া যাইতেছে এবং নূতন জলকণাসমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। সমগ্র বিশ্বজগৎও এইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়রাশি-মাত্র, যাবতীয় বস্তু উহারই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তস্বরূপ। কিছু জড়রাশি একটি আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল-ধর মানবদেহে-কিছুদিন ঐ আবর্ত ঘুবিয়া, পরিবর্তিত হইয়া, বাহির হইয়া আর একটি আবর্তে প্রবেশ করিল-এবার হয়তো কোন জন্তুর দেহে, কয়েক বৎসর পরে খনিজপদার্থ-নামে আর একপ্রকার আবর্তে প্রবেশ করিল। ক্রমাগত পরিবর্তন! কোন কিছুই স্থির নয়। আমার শরীর, তোমার শরীর বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই, ঐরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র। এক বিরাট জড়রাশির একটি বিন্দুর নাম চন্দ্র, আর একটি বিন্দুকে বলা হয় সূর্য, কোন বিন্দু মনুষ্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ্, অপর কোন বিন্দু হয়তো একটি খনিজ পদার্থ।

ইহাদের একটিও সর্বদা একভাবে থাকে না, সকল বস্তুই সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে; জড়ের একবার সংশ্লেষণ, আবার বিশ্লেষণ, চলিতেছে। মন বা অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও এই একই কথা। জগতের সমুদয় বস্তুই 'ইথার' হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহাকেই সমুদয় জড়বস্তুর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের সূক্ষ্মতর স্পন্দনশীল অবস্থায় এই 'ই থার'-কেই মনেরও প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। তথাপি 'ইথার' এক অখন্ড জড়বস্তুরূপেই থাকিবে। যদি সেই সূক্ষ্ম স্পন্দনের স্তরে উপনীত হইতে পারো, তবে অনুভব করিবে-সমগ্র জগৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্পন্দনে সংগঠিত। কখন কখন কোন ঔষধের শক্তিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে থাকিয়াও ঐরূপ অবস্থায় নীত হই। তোমাদের মধ্যে

অনেকের স্যার হাম্ফ্রি ডেভির (Sir Humphrey Davy) বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পারে। হাস্যজনক বাষ্প (Laughing gas) তাঁহাকে অভিভূত করিলে তিনি স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে তিনি বলেন, সমগ্র জগৎ ভাবরাশির সমষ্টিমাত্র। কিছুক্ষণের জন্য স্থূলকম্পনগুলি (gross vibration) যেন থামিয়া গিয়াছিল, কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনগুলি-যেগুলিকে তিনি 'ভাবরাশি' বলিয়া অভিহিত করেন শুধু সেইগুলিই তাঁহার অনুভূতিতে বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে কেবল সূক্ষ্ম কল্পনাগুলি দেখিতে পাইতেন। সবকিছু চিন্তারূপে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট সব যেন এক মহা ভাবসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক-একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত।

এইরূপে আমরা চিন্তাজগতেও এক অখন্ড ভাব দেখিলাম, অবশেষে যখন আমরা সেই আত্মাকে লাভ করি, তখন অনুভব করি-সেই আত্মাই এই অখন্ড 'এক'। সর্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ের স্পন্দনের অতীত-গতির ঊর্ধ্বে সেই এক অখন্ড সত্তা বিরাজ করিতেছেন। এমন কি, এই পরিদৃশ্যমান গতিসমূহের মধ্যেও-শক্তির বিকাশসমূহের মধ্যেও এক অখন্ড ভাব বিদ্যমান। এ-সকল তথ্য এখন আর অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, এই বিশ্বে শক্তিসমষ্টি সর্বত্র সমান। আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, শক্তিসমষ্টি দুই ভাবে অবস্থান করে-কখন স্তিমিত বা অব্যক্ত, পরে ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই-সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারন করে, আবার শান্ত অব্যক্ত রূপ প্রাপ্ত হয়, আবার ব্যক্ত হয়। এইরূপে উহা অনন্তকাল ধরিয়া কখন বিকশিত, কখন বা সঙ্কুচিত ভাব ধারণ করিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে-এই শক্তিরূপী প্রাণের নিয়ন্ত্রণের নামই প্রাণায়াম।

ফুসফুসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে বোঝা যায়। ফুসফুসের গতি বন্ধ হইলে দেহের সকল ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা নিজেদের এমনভাবে শিক্ষিত করেন যে, তাঁহাদের ফুসফুসের গতি রুদ্ধ হইয়া গেলেও শরীর জীবিত থাকে।

এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শ্বাসপ্রশ্বাস না লইয়া কয়েক মাস মাটির নীচে নিজেকে চাপা দিয়া জীবিত থাকিতে পারেন। সূক্ষ্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে স্থূলতর শক্তির সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম শক্তি লাভ করিতে করিতে শেষে আমরা চরম লক্ষ্যে উপনীত হই। যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে ফুসফুসের ক্রিয়াই অতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। উহা যেন যন্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্ররূপে অপর শক্তিগুলি চালাইতেছে। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ-ফুসফুসের এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা; এই গতির সহিত শ্বাসযন্ত্রও জড়িত। শ্বাসপ্রশ্বাস যে এই গতি উৎপন্ন করিতেছে, তাহা নয়, বরং এই গতিই শ্বাসপ্রশ্বাস উৎপন্ন করিতেছে। এই বেগই পাম্পের মতো বায়ুকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। প্রাণ এই ফুসফুসকে চালিত করিতেছে। এই ফুসফুসের গতি বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রাণায়াম শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়। যে পেশী-শক্তি ফুসফুসকে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে শক্তি স্নায়ু-মন্ডলীর ভিতর দিয়া মাংশপেশীতে যাইতেছে এবং পেশীর মাধ্যমে ফুসফুসকে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ; প্রাণায়াম-সাধনে এই প্রাণকেই বশে আনিতে হইবে। যখনই প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাইব-শরীরের মধ্যে প্রাণের অন্যান্য সমুদয় ক্রিয়াই আমাদের আয়ত্তে আসিয়াছে। আমি নিজেই এমন সব লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাদের শরীরের পেশীগুলি বশে আনিয়াছেন অর্থাৎ ইচ্ছামত সেগুলি চালনা করিতে পারেন। কেনই বা না পারিবেন? যদি কতকগুলি পেশী আমার ইচ্ছা অনুসারে সঞ্চালিত হয়, তবে প্রত্যেকটি পেশী ও স্নায়ু আমি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারির না কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? এখন আমাদের এই নিয়ন্ত্রণ-শক্তি লোপ পাইয়াছে, আর ঐ পেশীগুলি স্বয়ংক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি যে পশুরা ঐরূপ করিতে পারে। এই শক্তি চালনা করি না, বলিয়াই আমাদের এ শক্তি নাই। ইহাকেই পূর্বপুরুষদের গুণদোষের পুনরাবির্ভাব (atavism) বলা হয়।

আর ইহাও আমরা জানি, যে শক্তি এখন অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আনা যায়। খুব দৃঢ় পরিশ্রম ও অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেক সুপ্ত শক্তিকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্তী করা যাইতে পারে। এইভাবে বিচার

করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরের প্রত্যেক অংশকেই সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা কিছু মাত্র অসম্ভব নয়, বরং খুব সম্ভব। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহা করিয়া থাকেন। তোমরা হয়তো যোগশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সময় সমগ্র শরীর 'প্রাণ'-এর দ্বারা পূর্ণ কর। ইংরেজী অনুবাদে প্রাণ-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে শ্বাস। ইহাতে তোমরা সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারো, 'শ্বাসের দ্বারা সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে?' ইহা অনুবাদকেরই দোষ। শরীরের প্রত্যেকটি অংশই প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনীশক্তি দ্বারা পূর্ণ করা যাইতে পারে; আর যখনই তুমি এরূপ করিতে পারিবে, তখনই সমগ্র শরীর তোমার বশে আসিবে।

দেহে অনুভূত সকল ব্যাধি, সকল দুঃখ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আসিবে। শুধু তাই নয়, তুমি অপরের শরীরও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। পৃথিবীতে ভাল মন্দ সবই সংক্রামক। তোমার শরীরে যদি কোন এক বিশেষ ভাবের উত্তেজনা থাকে, অপরের ভিতরও সেই ভাবের প্রবণতা দেখা দিবে। যদি তুমি সবল ও সুস্থ হও, তোমার নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও সুস্থ ও সবল ভাব আসিবে। তুমি যদি রুগ্ন বা দুর্বল হও, তবে দেখিবে তোমার স্পন্দন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। যখন একজন অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন প্রথমে তাহার ভাবটি এইরূপ হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়া দিব। ইহা এক প্রকার আদিম চিকিৎসা-প্রণালী। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একজন আর একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। খুব বলবান্ ব্যাক্তি যদি কোন দুর্বল লোকের সঙ্গে সর্বদা বাস করে, তাহা হইলে সেই দুর্বল ব্যক্তি জানুক বা না জানুক কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। যখন এই প্রক্রিয়া জ্ঞাতসারে করা হয়, তখন ইহার ফল অপেক্ষাকৃত ত্বরান্বিত ও ভাল হইয়া থাকে। আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে স্বয়ং খুব সুস্থকায় না হইলেও একজন অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ আরোগ্যকারীর প্রাণের উপর প্রভুত্ব কিছুটা বেশী। তিনি কিছুক্ষণের জন্য নিজ প্রাণ উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট অবস্থায় উন্নীত করিয়া অপরের শরীরে ঐ স্পন্দন সঞ্চারিত করিতে পারেন।

অনেকস্থলে প্রক্রিয়াটি দূর হইতেও সংসাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ (break) হয়, তবে দূরত্ব বলিয়া কিছু নাই। এমন দূরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরস্পরের কিছুমাত্র সম্বন্ধ-কিছুমাত্র যোগ নাই? সূর্য ও তোমার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদ আছে? এক অবিচ্ছিন্ন অখন্ড বস্তু রহিয়াছে-তুমি তাহার এক অংশ, সূর্য তাহার আর এক অংশ। নদীর এক অংশ ও অপর অংশের মধ্যে কি ক্রমবিচ্ছেদ আছে? তাহা হইলে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে তো কোন যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। দূর হইতে রোগ আরোগ্য করার ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। এই প্রাণকে বহুদূরে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ-বিষয়ে একটি ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে শত শত ঘটনা কেবল জুয়াচুরি। লোকে এই আরোগ্য-প্রাণালীকে যত সহজ ভাবে-তত সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যাইবে যে, আরোগ্যকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার সুযোগ লইতেছেন। জগতে এমন কোন রোগ নাই যে, সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া সব লোকই মারা পড়ে। এমন কি, বিসূচিকা-মহামারিতেও যদি কিছুদিন শতকরা ৬০ জন মরে, তবে দেখা যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার কমিয়া শতকরা ৩০ হয়, পরে ২০তে দাঁড়ায়, অবশিষ্ট সকলে রোগমুক্ত হয়। এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা করিলেন, তাঁহার ঔষধ দিলেন।

হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক আসিয়া তাঁহার ঔষধ দিলেন হয়তো এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী আরোগ্য করিলেন, কারণ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক রোগীর শরীরে কোন গোলযোগ না বাধাইয়া প্রকৃতিকে নজের ভাবে কাজ করিতে দেন। বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারী আরও রোগী আরোগ্য করিবেন, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশ্বাসবলে রোগীর সুপ্ত প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া দেন।

কিন্তু বিশ্বাসবলে রোগ-আরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি ভুল হইয়া থাকে-তাঁহারা মনে করেন, সাক্ষাৎভাবে বিশ্বাসই মানুষকে রোগমুক্ত করে। বাস্তবিকপক্ষে কেবল বিশ্বাসই যে একমাত্র কারণ, তাহা বলা যায় না। এমন সব রোগ আছে, যেগুলির সর্বাপেক্ষা খারাপ

লক্ষণ এই-রোগী নিজে আদৌ মনে করে না যে, তাহার সেই রোগ হইয়াছে। রোগীর নিজের রোগহীনতা সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, সচরাচর ইহা আশু মৃত্যুরই সূচনা করে। এ-সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয়-এ তত্ত্ব খাটে না। যদি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হইত, তাহা হইলে এই-সকল রোগীও আরোগ্য লাভ করিত; প্রাণের শক্তিতেই রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। যে পবিত্রাত্মা পুরুষ নিজ প্রাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি ইহাকে এক নির্দিষ্ট কম্পনের অবস্থায় লইয়া গিয়া অপরের মধ্যে সেই প্রকার কম্পন সঞ্চারিত ও জাগ্রত করিতে পারেন। প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাইতে পারো। আমি বক্তৃতা দিতেছি, বক্তৃতা দিবার সময় কি করিতেছি? আমি আমার মনকে একপ্রকার কম্পনের অবস্থায় আনিতেছি; এবং এই-বিষয়ে আমি যতই কৃতকার্য হইব, তোমরা ততই আমার বাক্য দ্বারা প্রভাবিত হইবে। তোমরা সকলেই জানো, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব মাতিয়া উঠি, সেদিন আমার রক্তৃতা তোমাদের বেশী ভাল লাগে, আর আমার উৎসাহ অল্প হইলে আমার বক্তৃতা শুনিতে তোমাদেরও তত ভাল লাগে না।

জগৎ-আলোড়নকারী তীব্র-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রাণ এক অতি উচ্চ কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিতে পারেন; প্রাণ এত অধিক শক্তিসম্পন্ন হয় যে, উহা অন্যকে মুহূর্তমধ্যে স্পর্শ করে, সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং জগতের অর্ধেক লোক তাঁহাদের ভাবানুসারে ভাবিত হইয়া থাকে। জগতের মহাপুরুষগণ সকলেই প্রাণ জয় করিয়াছিলেন। এই প্রাণসংযমের বলে তাঁহারা প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণকে উচ্চতম কম্পনের অবস্থায় উন্নীত করিয়াই তাঁহারা জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি লাভ করেন। জগতে যতপ্রকার শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই প্রাণের সংযম হইতে উৎপন্ন। মানুষ ইহার গোপন তথ্য না জানিতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা। তোমার শরীরে এই প্রাণশক্তির সরবরাহ কখন এক দিকে বেশী, অন্য দিকে কম পড়িয়া যায়-সাম্য নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণের অসামঞ্জস্যেই রোগের উৎপত্তি। অতিরিক্ত প্রাণটুকু সরাইয়া যেখানে প্রাণের অভাব হইয়াছে, সেখানকার অভাব পুরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয়।

কোথায় অধিক, কোথয় বা অল্প প্রাণশক্তি আছে, ইহা জানাও প্রাণায়ামের অঙ্গ। অনুভবশক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে-পায়ের আঙ্গুলে বা হাতের আঙ্গুলে যতটুকুপ্রাণ আবশ্যক তাহা নাই এবং ঐ প্রাণের অভাব পূরণ করিবার শক্তিও মনের থাকিবে। প্রাণায়ামের এইরূপ নানা অঙ্গ আছে। ঐগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণকে সংযত করা এবং চালনা করাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য। যখন কেহ নিজের সব শক্তিকে সংহত করিয়াছে, তখন সে নিজ দেহস্থ প্রাণকেই আয়ত্ত করিয়াছে। যখন কেহ ধ্যান করে, সে প্রাণকেই সংযত করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

মহাসমুদ্রে পর্বততুল্য বৃহৎ তরঙ্গসমূহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ, আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গসমূহ, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদও রহিয়াছে। কিন্তু এই-সকলের পশ্চাতে এক অনন্ত মহাসমুদ্র; ঐ ক্ষুদ্র বুদ্বুদটি একদিকে অনন্ত সমুদ্রের সহিত, আবার অন্যদিকে সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এইরূপে সংসারে কেহ বা মহাপরুষ কেহ বা ক্ষুদ্র জল-বুদ্বুদতুল্য সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহাশক্তি-সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এই মহাশক্তিতে জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। যেখানেই জীবনীশক্তির প্রকাশ, সেখানেই পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভান্ডার রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছত্রাক (fungus)-হয়তো এত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা উহা দেখিতে হয়-তাহা হইতে আরম্ভ কর, দেখিবে অনন্ত শক্তির ভান্ডার হইতে ক্রমশঃ শক্তি সংগ্রহ করিয়া সেটি আর এক আকার ধারণ করিতেছে। কালে উহা উদ্ভিদ্রূপে পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধারণ করিল, পরে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবশেষে ঈশ্বরে পরিণত হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়। কিন্তু এই সময়ই বা কি? সাধনার বেগ ও গতি বৃদ্ধি করিয়া দিলে সময়ের সংক্ষেপ হইতে পারে। যোগীরা বলেন, যে কার্য করিতে সাধারনভাবে অধিক সময় লাগে, কার্যের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে তাহাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে। মানুষ এই বিশ্বের অনন্ত শক্তিরাশি হইতে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিতে পারে। এভাবে চলিলে একজনের দেবত্ব লাভ করিতে

হয়তো লক্ষ বৎসর লাগিবে। আরও উচ্চাবস্থা লাভ করিতে হয়তো পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিবে। আবার পূর্ণ বা সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিবে। উন্নতির বেগ বাড়াইলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে। যথেষ্ট চেষ্টা করিলে ছয় মাসে অথবা ছয় বৎসরে সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন? যুক্তি দ্বারা ইহা বুঝা যায়। কোন বাষ্পীয়যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা দিলে প্রতি ঘন্টায় দুই মাইল করিয়া যাইতে পারে; আরও অধিক কয়লা দিলে আরও শীঘ্র যাইবে। এইরূপে তীব্রসংবেগসম্পন্ন১ হইলে জীবাত্মা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে না পারিবে কেন? সকলেই শেষে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা আমরা জানি।

১ যোগসুত্র, ১। ২১

কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এই ক্ষণেই, এই শরীরেই-এই মানুষ্যদেহেই মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ হইবে? এই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনই লাভ করিব না কেন?

আত্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে, ইহাই যোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সকল মানুষ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, একটু একটু অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিভান্ডার হইতে শক্তি গ্রহন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া কিরূপে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করা যায়, যোগীরা তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। জগতের সকল মহাপুরুষ-সাধু ও সিদ্ধপুরুষ কি করিয়াছন? এক জীবনেই তাঁহারা মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করেন, সাধারণ মানুষের পূর্ণত্ব লাভ করিতে যে দীর্ঘকাল লাগে, সেই কাল তাঁহারা এই জীবনেই অতিক্রম করেন। এক জন্মেই তাঁহারা নিজেদের সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা আর কিছুই চিন্তা করেন না, অন্য কোন ভাবের জন্য একমুহূর্ত সময় কাটান না। এইরূপেই তাঁহাদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়। একাগ্রতা বলিতে বুঝায়-শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমাতাবৃদ্ধি; এইভাবেই সময় সংক্ষিপ্ত করা হয়। রাজযোগ-বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দেয়-কিভাবে এই একাগ্রতা-শক্তি করা যায়।

প্রাণায়ামের সহিত প্রেততত্ত্বের সম্বন্ধ কি? প্রেততত্ত্ব প্রাণায়ামেরই এক প্রকার শক্তি বিকাশ। যদি ইহা সত্য হয় যে, পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব আছে, আমরা শুধু উহাদিগকে দেখিতে পাই না, তাহা হইলে ইহাও খুব সম্ভব যে, এখানেই হয়তো শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা দেখিতে, অনুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না। আমরা হয়তো সর্বদাই তাহাদের শরীরের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছি। আর ইহাও খুবই সম্ভব যে, তাহারাও আমাদিগকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে পারে না। ইহা-একটি বৃত্তের ভিতর আর একটি বৃত্ত, একটি জগতের ভিতর আর একটি জগৎ। যাহারা এক ভূমিতে (Plane) থাকে, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পায়। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট প্রাণী, আমাদের প্রাণের স্পন্দন এক বিশেষ স্তরের। তাহাদের প্রাণের স্পন্দন একই প্রকারের, তাহারাই পরস্পরকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু যদি এমন কোন প্রাণী থাকে যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্পন্দনশীল, তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইব না। আলোকের তীব্রতা অতিশয় বর্ধিত হইলে আমরা উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষু এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, তাহারা ঐরূপ আলোকও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের স্পন্দন অতি মৃদু হয়, তখনও উহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু পেচক বিড়ালাদি জন্তুগণ উহা দেখিতে পায়। আমাদের দৃষ্টির সীমা এই প্রাণস্পন্দনের একটি স্তরেই অবস্থিত। অথবা বায়ুরাশির কথা ধর; বায়ু স্তরে যেন সজ্জিত রহিয়াছে। এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর, তাহা উপরের স্তর অপেক্ষা অধিক ঘন; আরও উর্ধ্বদেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, বায়ু ক্রমশঃ পাতলা হইতেছে।

অথবা সমুদ্রের দৃষ্টান্ত লও; সমুদ্রের যতই গভীর হইতে গভীরতর স্তরে যাইবে, জলের চাপ ততই বাড়িতে থাকিবে। যে-সকল জন্তু সমুদ্রতলে বাস করে, তাহারা কখনই উপরে আসিতে পারে না, কারণ আসিলেই খন্ডখন্ডরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

সমগ্র জগৎকে 'ইথার'-এর একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর। প্রাণের শক্তিতে যেন উহা স্পন্দিত হইতেছে, বিভিন্ন গ্রামে স্পন্দিত হইয়া উহা যেন স্তরে স্তরে অবস্থিত। যে কেন্দ্র হইতে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই সেই স্পন্দন

মৃদুভাবে অনুভূত হয়। কেন্দ্রের নিকট স্পন্দন অতি দ্রুত। এক-এক প্রকারের স্পন্দনে এক-একটি স্তর। তারপর মনে কর, এই-সকল স্পন্দনের স্তর বিভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত হইল-লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত একটি স্তর, আবার লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত আর একটি উচ্চতর স্পন্দনের স্তর এইরূপ চলিতে থাকবে। এইভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা এক স্তরে বাস করে, তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা নিম্ন বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে চিনিতে পারিবে না। তথাপি যেমন আমরা অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির সীমা বাড়াইতে পারি, সেইরূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দনবিশিষ্ট করিয়া অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ সেখানে কি হইতেছে, জানিতে পারি। মনে কর, এই গৃহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহাদের আমরা দেখিতে পাইতেছি না। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দনের ও আমরা আর এক প্রকার স্পন্দনের ফলস্বরূপ। মনে কর, তাহারা অধিক স্পন্দনবিশিষ্ট ও আমর অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দনশীল। তাহারা প্রাণ-রূপ মূলবস্তু হইতে গঠিত, আমরাও তাই। সকলেই এক প্রাণ-সমূদ্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র, তবে বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের বেগে। যদি মনকে দ্রত স্পন্দনবিশিষ্ট করিতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তর পরিবর্তিত হইবে, আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না, তোমরা আমার সন্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে ও অপরে আবির্ভূত হইবে। তোমাদের মাধ্যে অনেকেই হয়তো জানো যে, এই ব্যাপার সত্য। মনকে উচ্চতর স্পন্দনের স্তরে উন্নীত করাকেই যোগশাস্ত্রে এক কথায় ‘সমাধি’ বলা হয়। এ-সকল উচ্চতর স্পন্দনের অবস্থাকে, মনের অতিচেতন স্পন্দনকে ‘সমাধি’ নামক একটি শব্দের অন্তর্ভূক্ত করা হয়; সমাধির নিম্নতর অবস্থাতেই ঐ-সব প্রেতাত্মা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমরা সত্যস্বরূপকে দর্শন করি, তখন আমরা দেখিতে পাই, কি উপাদানে এই সব নানা স্তরের জীব গঠিত। ‘একটি মৃৎপিন্ডকে জানিলে জগতের সকল মৃত্তিকাই জানা হইয়া যায়।’

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেততত্ত্ববিদ্যায় যেটুকু সত্য আছে, তাহাও এই প্রাণায়ামের অন্তর্ভূক্ত। এইরূপ যখনই দেখিবে, কোন এক দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রয় রহস্যবিদ্যা বা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে

তাহারা প্রকৃতপক্ষে কিছু পরিমাণে এই রাজযোগই সাধন করিতেছে, প্রাণসংযমের চেষ্টা করিতেছে।

যেখানেই কোনরূপ অসাধারণ শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সেখানেই দেখিবে-এই প্রাণের অভিব্যক্তি। জড়বিজ্ঞানগুলিও প্রাণায়ামের অন্তর্ভূক্ত করা যাইতে পারে। বাষ্পীয় যন্ত্রকে কে চালিত করে? প্রাণই বাষ্পের মধ্য দিয়া উহাকে চালাইয়া থাকে। তড়িৎ প্রভৃতির যে অত্যদ্ভুত ক্রিয়াসমূহ দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণশক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পদার্থ-বিজ্ঞানই বা কি? উহা বাহ্য উপায়ে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম-বিজ্ঞান। প্রাণ যখন মনঃশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মানসিক উপায়েই উহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। প্রাণায়াম-বিজ্ঞানের যে অংশে প্রাণের স্থূল প্রকাশগুলিকে বাহ্য উপায়ের দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে। আর প্রাণায়ামের যে অংশে মনঃশক্তিরূপ প্রাণের বিকাশগুলিকে মানসিক উপায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়, তাহাকেই ‘রাজযোগ’ বলে।

৪. প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ (চতুর্থ অধ্যায়)

যোগিগণের মতে মেরুদন্ডের মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি স্নয়বীর শক্তিপ্রবাহ ও ‘সুষুম্না’ নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নিম্নপ্রান্তে ‘কুন্ডলিনী পদ্ম’ অবস্থিত, যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগীদের রূপক ভাষায় ঐ স্থানে কুন্ডলিনী শক্তি কুন্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমানা। যখন এই কুন্ডলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন, এবং যতই তিনি এক-এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের যেন স্তরের পর স্তর খুলিয়া যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে। যখন সেই কুন্ডলিনী মস্তিষ্কে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীর ও মন হইতে পৃথক্ হইয়া যান এবং তাঁহার আত্মা স্বীয় মুক্তভাব উপলব্ধি করে।

আমরা জানি সুষুম্নাকান্ড (Spinal cord) এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, ৪-এই অক্ষরটিকে যদি লম্বালম্বি ভাবে (∞) লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার দুইটি অংশ রহিয়াছে এবং ঐ দুইটি মধ্যদেশে সংযুক্ত। এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর একটি সাজাইলে যেরূপ দেখায়, সুষুম্নাকান্ড কতকটা সেইরূপ। উহার বামভাগ ‘ইড়া’, দক্ষিণ ভাগ ‘পিঙ্গলা’ এবং যে শূন্য নালী সুষুম্না-কান্ডের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে-তাহাই ‘সুষুম্না’। কটিদেশের নিকট মেরুদন্ডের কতকগুলি অস্থির পরেই সুষুম্নাকান্ড শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও একটি অতিসূক্ষ্ম তন্তু বরাবর নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। সুষুম্না নালী ঐ তন্তুর মধ্যেও অবস্থিত, তবে অতি সূক্ষ্ম হইয়াছে মাত্র। নিম্নদিকে ঐ নালীর মুখ বন্ধ থাকে। উহার নিকটেই কটিদেশস্থ স্নায়ুজাল (Sacral plexus) অবস্থিত। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) মতে-উহা ত্রিকোণাকৃতি। বিভিন্ন স্নায়ুজালের কেন্দ্র সুষুম্নার মধ্যে অবস্থিত; ঐগুলিকেই যোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যোগী কল্পনা করেন, সর্বনিম্নে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্কে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা ঐ পদ্মগুলিকে পূর্বোক্ত স্নায়ুজাল (Plexus) বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝা যাইবে। আমরা জানি, আমাদের স্নায়ুমধ্যে দুই প্রকারের প্রবাহ আছে; তাহাদের একটিকে অন্তর্মুখ ও অপরটিকে বহির্মুখ, একটিকে সংবেদাত্মক (sensory) ও অপরটিকে চেষ্টাত্মক (motor), একটিকে কেন্দাভিগ ও অপরটিকে কেন্দ্রাতিগ বলা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটি মস্তিষ্কের অভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটি মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়া যায়।

ঐ স্পন্দন-প্রবাহগুলি শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। পরবর্তী ব্যাখ্যা সুগম ও স্পষ্ট করিবার জন্য আমাদের অন্যান্য কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। সুষুম্নাকান্ড মস্তিষ্ক-মজ্জায় একটি কন্দে (bulb) শেষ হইয়াছে; কিন্তু উহা মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত নয়, মস্তিষ্কের অন্তর্গত তরল পদার্থে ভাসমান। মাথায় যদি কোন আঘাত লাগে, তবে ঐ আঘাতের শক্তি ঐ তরল পদার্থেই ব্যয়িত হইয়া যায়, কন্দ আহত হয় না। ইহা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ আরও জানিতে হইবে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্বনিম্নস্থ মূলাধার, মস্তকস্থ সহস্রদল-পদ্ম ও নাভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র-এই তিনটির কথা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক।

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। আমরা সকলেই তড়িৎ ও তৎসম্পর্কে অন্যান্য বহুবিধ শক্তির কথা শুনিয়াছি। তড়িৎ কি, তাহা কেহই জানে না; তবে আমরা এই পর্যন্ত জানি যে, তড়িৎ একপ্রকার গতিবিশেষ। জগতে অন্যান্য নানাবিধ গতি আছে, তড়িতের সহিত উহাদের প্রভেদ কি? মনে কর, একটি টেবোল নড়িতেছে-যে পরমাণুগুলি দ্বারা উহা গঠিত, সেগুলি বিভিন্ন দিকে আন্দোলিত হইতেছে। যদি উহাদিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা তড়িৎশক্তির দ্বারাই সম্ভব হইবে। তড়িৎপ্রবাহই কোন পদার্থের পরমাণুগুলিকে একদিকে গতিশীল করে। এই গৃহে যে বায়ুরাশি রহিয়াছে, তাহার সব পরমাণুগুলিকে একদিকে গতিশীল করে। এই

গৃহে যে বায়ুরাশি রহিয়াছে, তাহার সব পরমাণুগুলিকে যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে ঘরটি এক বিরাট বিদ্যুদাধারযন্ত্রে (Battery) পরিণত হইবে।

শারীরবিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। তত্ত্বটি এইঃ যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বাস-যন্ত্রগুলি নিয়মিত করে, স্নায়ুপ্রবাহগুলির উপরও তাহার একটু প্রভাব আছে; ঐ কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদন্ডে অবস্থিত, উহা শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করে এবং অন্যান্য যে-সকল স্নায়ুচক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে।

এইবার আমরা প্রাণায়াম-ক্রিয়া সাধনের কারণ বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা শরীরের সমুদয় পরমাণুই একদিকে গতিসম্পন্ন হইবার প্রবণতা লাভ করিবে। যখন মন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় স্নায়ুপ্রবাহও এক প্রকার তড়িৎ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়; কারণ, দেখা গিয়াছে-স্নায়ুগুলির উপর তড়িৎপ্রবাহের প্রভাবে স্নায়ুর উভয় প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বয়ের উদ্ভব হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, যখন ইচ্ছাশক্তি স্নায়ুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন উহা তড়িতের মতো কোন শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। যখন শরীরের সমুদয় গতি সম্পূর্ণ সমতালে চালিত হয়, তখন শরীরে যেন ইচ্ছাশক্তির এক প্রবল বিদ্যুদাধার-স্বরূপ হইয়া পড়ে। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম-ক্রিয়াটি এইরূপে শারীরবিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে ছন্দের মতো একপ্রকার গতি উৎপাদন করে ও শ্বাসপ্রশ্বাসকেন্দ্রের উপর আধিপতা বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য করে। এস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য- মূলাধারে কুন্ডলাকারে অবস্থিত কুন্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করা।

আমরা যাহা কিছু দেখি বা কল্পনা করি অথবা যখন স্বপ্ন দেখি,সবই আকাশে অনুভব করিতে হয়। এই পরিদৃশ্যমান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার নাম মহাকাশ। যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন বা অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ অনুভব করেন, তখন তিনি ঐগুলি আর এক প্রকার আকাশে-চিত্তাকাশে বা মানস আকাশে দেখিতে পান। আর

যখন আমাদের অনুভূতি বিষয়শূন্য হয়, যখন আত্মা নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হন, তখন উহার নাম 'চিদাকাশ' বা জ্ঞানের আকাশ। যখন কুন্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইয়া সুষুম্না-নাড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে-সকল বিষয় অনুভূত হয়, সেগুলি চিত্তাকাশেই হইয়া থাকে। ঐ নালীর শেষ সীমা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে চিদাকাশে এক বিষয়শূন্য জ্ঞান অনুভূত হইয়া থাকে।

এইবার তড়িৎ-শক্তির উপমা আবার লওয়া যাক। আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তড়িৎপ্রবাহ এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করিতে পারে।১ কিন্তু প্রকৃতি তাহার নিজের প্রচন্ড শক্তিপ্রবাহ প্রেরণ করিতে কোন তারের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রবাহ চালাইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আবশ্যকতা নাই, তবে আমর উহা ছাড়া কাজ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের তার প্রয়োজন।

তড়িৎপ্রবাহ যেমন তারের সাহায্যে প্রেরিত হয়, ঠিক তেমনি স্নায়ুতন্তুরূপ তারের সাহায্যে শরীরের সর্ববিধ সংবেদন মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে ও মস্তিষ্ক হইতে কর্মপ্রচেষ্টা বহিরিন্দ্রিয়ে প্রেরিত হইতেছে। সুষুম্না-মধ্যস্থিত জ্ঞানাত্মক ও কর্মাত্মক স্নায়ুতন্তুগুলিই যোগিগণের ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। প্রধানতঃ ঐ দুইটি নাড়ীর ভিতর দিয়াই পূর্বোক্ত অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ শক্তিপ্রবাহদ্বয় চলাচল করিতেছে। কিন্তু কথা হইতেছে, কোন তারের সাহায্য ব্যতীত মন কেন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিবে না অথবা প্রতিক্রিয়া করিবে না? প্রকৃতিতে তো এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যাইতেছে। যোগীরা বলেন, এরূপ করিতে পারিলেই জড়ের বন্ধন অতিক্রম করা যাইতে পারে। ইহা করিবার উপায় কি? যদি মেরুদন্ডমধ্যস্থ সুষুম্নার ভিতর দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ চালাইতে পারো, তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। মনই এই স্নায়ুজাল নির্মাণ করিয়াছে, মনকেই ঐ জাল ছিন্ন করিতে হইবে। কোনরূপ তারের সাহায্য ছাড়াই কাজ করিতে হইবে। তখনই সমুদয় জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জন্যই সুসুম্না নাড়ীকে জয় করা আমাদের এত প্রয়োজন। যদি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া নাড়ীজালের সাহায্য

ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ চালাইতে পারি, যোগীরা বলেন, তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। যোগীরা আরও বলেন, ইহা করিতে পারা যায়।

১ পাঠক স্মরণ রাখিবেন, বেতার-আবিষ্কারের পুর্বে ইহা লিখিত।

সাধারণ লোকের শরীরে সুষুম্না নিম্নদিকে বন্ধ; উহার দ্বারা কোন ক্রিয়াই হয় না। যোগীরা বলেন, এই সুষুম্নাদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া উহার মধ্য দিয়া স্নায়ুপ্রবাহ চালাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকার্য হইলে স্নায়ুপ্রবাহ উহার মধ্য দিয়া চালাইতে পারা যায়। বাহ্য বিষয়স্পর্শে উৎপন্ন প্রবাহ যখন কোন কেন্দ্রে উপনীত হয়, তখন ঐ কেন্দ্র হইতে এক প্রতিক্রিয়া (reaction) উপস্থিত হয়। স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রগুলিতে ঐ প্রতিক্রিয়ার ফলে গতি উৎপন্ন হয়; চৈতন্যময় কেন্দ্রগুলিতে (conscious centres) কিন্তু প্রথমে অনুভব, পরে গতি উৎপন্ন হয়। সমুদয় অনুভূতিই বাহির হইতে আগত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে স্বপ্নে অনুভূতি হয় কিরূপে? তখন তো বাহিরের কোন ক্রিয়া নাই, তবে বিষয়াভিঘাত-জনিত স্নায়বীয় গতিগুলি শরীরের কোথাও কুন্ডলীকৃতভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটি নগর দেখিলাম; সেই নগরের বহির্বস্তুরাজির আঘাতের প্রতিঘাতেই আমার সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ সেই নগরের বহির্বস্তুনিচয় দ্বারা আমার অন্তর্বাহী স্নায়ুমন্ডলীর মধ্যে যে গতিবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা মস্তিষ্কমধ্যস্থ পরমাণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন-অনেক দিন পরেও ঐ নগরটি মনে করিতে পারি। স্মৃতিতেও ঠিক ঐ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে, তবে মৃদুতরভাবে। কিন্তু যে ক্রিয়া মস্তিষ্কের ভিতর অনুরূপ মৃদুতর স্পন্দন তোলে, তাহাই বা কোথা হইতে আসে? উহা সেই প্রথম সংবেদন-জনিত, তাহা কখনই বলা যায় না। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ঐ সংবেদন-জনিত গতিপ্রবাহগুলি শরীরে কোথাও কুন্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে, এবং উহাদের অভিঘাতের ফলে স্বপ্নকালীন অনুভূতিরূপ মৃদু প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়।

যে কেন্দ্রে সংবেদনগুলির অবশিষ্টাংশ বা সংস্কারসমষ্টি যেন সঞ্চিত থাকে, তাহাকে ‘মূলাধার’ বলে, আর ঐ কুন্ডলীকৃত ক্রিয়াশক্তিকে ‘কুন্ডলিনী’ বলে। সম্ভবতঃ চেষ্টাশক্তির অবশিষ্টাংশও এই স্থানেই কুন্ডলীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে; কারণ, বাহ্যবস্তুর দীর্ঘকাল

চিন্তা ও গভীর অধ্যয়নের পর শরীরের যে স্থানে ঐ মূলাধার চক্র (সম্ভবতঃ ত্রিকাস্থি-স্নায়ুজাল=Sacral Plexus) অবস্থিত, তাহা উষ্ণ হইতে দেখা যায়। যদি এই কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া ক্রিয়াশীল করা যায়, তারপর জ্ঞাতসারে সুষুম্না-নালীর ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া যায়, তবে উহা যেমন যেমন এক কেন্দ্রের পর আর এক কেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হইবে। যখন কুন্ডলিনী-শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন তাহাই স্বপ্ন অথবা কল্পনা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু যখন ঐ দীর্ঘকালসঞ্চিত বিপুল শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র ধ্যানের শক্তিতে সুষুম্নামার্গ অতিক্রম করিতে থাকে, তখন যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা অতি প্রবল। তাহা স্বপ্ন বা কল্পনাকালীন প্রতিক্রিয়া হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, জাগ্রৎকালীন বিষয়জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হইতেও অনন্তগুণে প্রবল।

ইহাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আর এই অবস্থায় মন জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে বলা যায়। আবার যখন উহা সমুদয় জ্ঞানের-সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্কে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন সমুদয় মস্তিষ্ক ও উহার অনুভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই যেন প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে; ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা আত্মানুভূতি। কুন্ডলিনী-শক্তি যেমন যেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে যায়, অমনি যেন মনের এক-একটি স্তর উন্মুক্ত হইয়া যায়, এবং তখন যোগী এই জগতের সূক্ষ্ম বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে থাকেন। তখনই সংবেদন ও উহার প্রতিক্রিয়ারূপে জগতের কারণসমূহের যথার্থ জ্ঞান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের সর্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান হইবে। কারণটি জানিতে পারিলেই কার্যের জ্ঞান নিশ্চয়ই আসিবে।

এইরূপে দেখা গেল যে, কুন্ডলিনীকে জাগ্রত করাই দিব্যজ্ঞান-জ্ঞানাতীত অনুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভের একমাত্র উপায়। কুন্ডলিনী জাগরণের অনেক উপায় আছেঃ কাহারও ভগবৎপ্রেমবলে, কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপায়, কাহারও বা সূক্ষ্ম জ্ঞানবিচার দ্বারা। লোকে যাহাকে অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান বলিয়া থাকে, যখনই কোথাও তাহার

কিছু প্রকাশ দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুন্ডলিনী-শক্তি কোন মতে সুষুম্নার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিয়া হঠাৎ এমন কোন-সাধন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাহার অজ্ঞাতসারে কুন্ডলিনীশক্তির কিয়ৎপরিমাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিয়াছে। সর্বপ্রকার উপাসনাই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে এই একই লক্ষে পৌঁছিয়া দেয়। যিনি মনে করেন, প্রার্থনার উত্তর পাইতেছি, তিনি জানেন না যে, প্রার্থনা-রূপ মনোবৃত্তি দ্বারা তিনি তাঁহারই দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং মানষ না জানিয়া যাঁহাকে নানা নামে-ভয়ে ও দুঃখের ভিতর দিয়া উপাসনা করে, তাঁহার নিকট কিভাবে অগ্রসর হইতে হয় জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে প্রকৃত শক্তিরূপে কুন্ডালাকারে বিরাজমান এবং তিনি সকল সুখের জননী-যোগিগণ জগতের সমক্ষে ইহাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সুতরাং রাজযোগই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। উহাই সকল উপাসনা, সকল প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্ধতি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।

৫. অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম (পঞ্চম অধ্যায়)

এখন আমাদের প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম অঙ্গই ফুসফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের উদ্দেশ্য-শরীরের মধ্যে যে-সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতি আছে, সেগুলি অনুভব করা। আমাদের মন বহির্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, উহা ভিতরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতিগুলিকে মোটেই ধরিতে পারে না। অনুভব করিতে পারিলেই সেগুলিকে আমরা জয় করিতে পারিব। এই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহগুলি শরীরের সর্বত্র চলিতেছে; প্রতি পেশীতে উহারা প্রাণ ও জীবনশক্তি সঞ্চার করিতেছে; কিন্তু আমরা সেই প্রবাহগুলি অনুভব করিতে পারি না। যোগীরা বলেন, চেষ্টা করিলে আমরা ঐগুলি অনুভব করিতে শিখিতে পারি। কিভাবে? প্রথমে ফুসফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিছুকাল ইহা করিতে পারিলেই আমরা সূক্ষ্মতর গতিগুলিও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব।

এখন প্রাণায়ামের সাধন ও ক্রিয়াগুলির কথা সমালোচনা করা যাক। সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে, শরীরকে ঠিক সোজাভাবে রাখিতে হইবে। সুষুম্নাকান্ডটি যদিও মেরুদন্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত তথাপি মেরুদন্ডে সংলগ্ন নয়। বক্র হইয়া বসিলে সুষুম্নাপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়; অতএব দেখিতে হইবে, উহা যেন স্বচ্ছন্দভাবে থাকে। বক্র হইয়া বাসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হয়। শরীরের তিনটি ভাগ-বক্ষোদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সর্বদা এক রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া যাইবে। তারপর স্নায়ুগুলি বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, যে স্নায়ুকেন্দ্র শ্বাসপ্রশাস-যন্ত্রের কার্য নিয়মিত করে, অপরাপর স্নায়ুগুলির উপরও তাহার কতকটা প্রভাব আছে। এই জন্যই শ্বাসপ্রশ্বাস তালে তালে (rhythmical) হওয়া আবশ্যক। আমরা সচরাচর যেভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি,

তাহা শ্বাসপ্রশ্বাস নামের যোগ্যই হইতে পারে না, উহা এত অনিয়মিত। আবার স্ত্রীপুরুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যেও একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে।

প্রাণায়াম-সাধনের প্রথম ক্রিয়া এইঃ নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর ও নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে দেহযন্ত্রটির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। কিছুদিন অভ্যাস করিবার পর এই শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় 'ওঙ্কার' অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিলে ভাল হয়। প্রাণায়ামের সময় এক, দুই, তিন,চার-এই ক্রমে সংখ্যা গণনা না করিয়া ভারতে আমরা কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ (বীজমন্ত্র) ব্যাবহার করিয়া থাকি।

এই জন্যই আমি প্রাণায়ামের সময় 'ওঁ' অথবা অন্য কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি। মনে করিবে, উহা শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে; এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই ছন্দের তালে তালে চালিত হইতেছে। তখনই বুঝিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। উহার সহিত তুলনায় নিদ্রা বিশ্রামই নয়। একবার এই বিশ্রামের অবস্থা আসিলে অতিশয় শ্রান্ত স্নায়ুগুলি পর্যন্ত জুড়াইয়া যাইবে,আর তখন বুঝিবে যে, পূর্বে কখনও তুমি প্রকৃত বিশ্রাম লাভ কর নাই।

এই সাধনে প্রথম ফল দেখা যায়-মুখভাবের পরিবর্তনে, মুখের শুষ্কতা বা কঠোরতাব্যঞ্জক রেখাগুলি অন্তর্হিত হইবে। মনের শান্তি মুখে ফুটিয়া বাহির হইবে। তারপর গলার স্বর অতি সুন্দর হইবে। আমি এমন যোগী একজনও দেখি নাই, যাঁহার গলার স্বর কর্কশ। কয়েক মাস সাধনার পরই এই-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। এই প্রথম (পূর্বোক্ত প্রকারের) প্রাণায়াম কিছুদিন অভ্যাস করিয়া উচ্চতর প্রাণায়ামের আর একটি সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। উহা এই-ইড়া অর্থাৎ বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে ফুসফুস বায়ুতে পূর্ণ কর। ঐ সঙ্গে স্নায়ুপ্রবাহের উপর মনঃসংযম কর; ভাবো, তুমি যেন স্নায়ুপ্রবাহকে মেরুদন্ডের নিম্নদেশে প্রেরণ করিয়া কুন্ডলিনী-শক্তির আধারভূত মূলাধারস্থিত ত্রিকোণাকৃতি পদ্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ; তারপর ঐ স্নায়ুপ্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্য ঐ স্থানেই ধারণ কর। তারপর কল্পনা কর যে, সেই স্নায়ুপ্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক বা পিঙ্গলার দ্বারা

উপরে টানিয়া লইতেছ। পরে দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে বাহিরে নিক্ষেপ কর। ইহা অভ্যাস করা তোমার পক্ষে একটু কঠিন বোধ হইবে। সহজ উপায়-প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিন নাসা বন্ধ করিয়া বাম নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ কর। তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা উভয় নাসা বন্ধ কর ও মনে কর, যেন তুমি বায়ুপ্রবাহটিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছ এবং সুষুম্নার মূলদেশে আঘাত করিতেছ, তারপর অঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন কর। তারপর বাম নাসা তর্জনী দ্বারা বন্ধ রাখিয়াই দক্ষিণ নাসা দ্বারা ধীরে ধীরে পূরণ কর ও পুনরায় পূর্বের মতো উভয় নাসারন্ধ্রই বন্ধ কর। হিন্দুদিগের মতো প্রাণায়াম অভ্যাস করা এদেশের (আমেরিকার) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ হিন্দুরা বাল্যকাল হইতেই ইহা অভ্যাস করে, তাহাদের ফুসফুস ইহাতে অভ্যস্ত। এখানে চারি সেকেন্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই ভাল হয়। চারি সেকেন্ড ধরিয়া বায়ু পূরণ কর, ষোল সেকেন্ড বন্ধ কর, পরে আট সেকেন্ড ধরিয়া বায়ু রেচন কর। ইহাতেই একটি প্রাণায়াম হইবে। ঐ সময়ে মূলাধারস্থ ত্রিকোণাকার পদ্মটি চিন্তা করিতে করিতে ঐ কেন্দ্রে মন স্থির করিবে। এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক সুবিধা হইবে।

পরবর্তী (তৃতীয়) প্রাণায়াম এইঃ ধীরে ধীরে ভিতরে শ্বাস গ্রহণ কর, পরে সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিয়া বাহিরেই কিছুক্ষণের জন্য শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখো,

সংখ্যা-পূর্ব প্রাণায়ামের মতো। পূর্ব প্রাণায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, এক্ষেত্রে উহাকে বাহিরে বুদ্ধ করা হইল। এই শেষোক্ত প্রাণায়াম পূর্বাপেক্ষা সহজ। যে প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ত অভ্যাস করা ভাল নয়। উহা প্রাতে চার বার ও সায়ংকালে চার বার মাত্র অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারো। ক্রমশঃ দেখিবে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব আনন্দও পাইতেছ। অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা-চার হইতে ছয়-বৃদ্ধি করিতে পারো। অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে।

নাড়ীশুদ্ধির জন্য বর্ণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়া-দুইটি কঠিন নয়, এবং উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। প্রথম ক্রিয়াটি যতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শান্তভাব আসিবে। উহার সহিত 'ওঙ্কার' যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন তুমি কোন কার্যে নিযুক্ত আছ, তখনও তুমি উহা অভ্যাস করিতে পারিতেছ। এই ক্রিয়ার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই বোধ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয়তো খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুন্ডলিনী জাগরিতা হইবেন। যাঁহারা দিনের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ স্থিরতা ও সুস্থতা লাভ হইবে, গলার স্বর মধুর হইবে। কিন্তু যাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া সাধনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কুন্ডলিনী জাগরিতা হইবেন; তাঁহাদের নিকট সমগ্র প্রকৃতিই আর এক নব রূপ ধারণ করিবে, তাঁহাদের নিকট জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তখন আর গ্রন্থে জ্ঞান অন্বেষণ করিতে হইবে না, মনই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশষ্ট পুস্তকের কাজ করিবে। আমি পূর্বেই মেরূদন্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটি শক্তিপ্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর মেরুমজ্জার মধ্যস্থ সুষুম্নার কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মেরূদন্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে। তবে যোগীরা বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে সুষুম্না বদ্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের কার্য শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি বহন করা।

কেবল যোগীরই এই সুষুম্না উন্মুক্ত থাকে। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া গিয়া তাহার মধ্য দিয়া স্নায়ুশক্তিপ্রবাহ যখন উপরে উঠিতে থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলিয়া যাই। আমাদের মন তখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে, তখন আমরা বুদ্ধিরও অতীত দেশে চলিয়া যাই, যেখানে তর্ক পৌঁছিতে পারে না। এই সুষুম্নাকে উন্মুক্ত করাই যোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্বে যে-সকল শক্তিবহনকেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে

সেগুলি সুষুম্নার মধ্যেই অবস্থিত। রূপক ভাষায় সেগুলিকেই পদ্ম বলে। সর্বনিম্নে সুষুম্নার নিম্নভাগে অবস্থিত পদ্মটির নাম (১ম) মূলাধার, তার ঊর্ধ্বে (২য়) স্বাধিষ্ঠান, (৩য়) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা, সর্বশেষে (৭ম) মস্তিষ্কস্থ সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম।

ইহাদের মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জানা আবশ্যক-সর্বনিম্নে মূলাধার ও সর্বোচ্চ কেন্দ্রে অবস্থিত সহস্রার। সর্বনিম্ন চক্রেই সমুদয় শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান হইতে উহাকে মস্তিষ্কস্থ সর্বোচ্চ চক্রে লইয়া যাইতে হইবে। যোগীরা বলেন, মনুষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত তাহাদের মধ্যে মহত্তম শক্তি ওজঃ। এই ওজঃ মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে। যাহার মস্তকে যে পরিমাণ ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্ হয়। এক ব্যাক্তি অতি সুন্দর ভাব ব্যাক্ত করিতেছে, কিন্তু লোক আকৃষ্ট হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি যে খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে তাহা নয়, তবু তাহার কথায় লোকে মুগ্ধ হইতেছে। ওজঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে। এই ওজঃশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে-কোন কার্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। ইহাই ওজোধাতুর শক্তি।

সকল মানুষের ভিতরেই অল্পাধিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। ইহা আমাদের সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। বহির্জগতে যে শক্তি তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ অভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হইবে, পেশীর শক্তিগুলিও ওজোরূপে পরিণত হইবে। যোগীরা বলেন, মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়া কামচিন্তা ইত্যাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সংযত হইলে সহজেই ওজোরূপে পরিণত হইয়া যায়। আর আমাদের শরীরস্থ নিম্নতম কেন্দ্রটি এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। যোগীরা সমুদয় কামশক্তিকে ওজোধাতুতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। পবিত্র কামজয়ী নরনারীই কেবল এই ওজোধাতুকে মস্তিষ্কে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই সর্বদেশে ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ

ধর্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, অপবিত্র হইলে এবং ব্রহ্মচর্যের অভাবে আধ্যাত্মিক ভাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজ -সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে-সব ধর্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই-সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এই জন্যই বিবাহত্যাগী সন্ন্যাসিদলের উৎপত্তি হইয়াছে। কায়মনোবাক্যে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা নিত্যন্ত কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত রাজযোগসাধন বড় বিপৎসঙ্কুল; উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইতে পারে। যদি কেহ রাজযোগ অভ্যাস করে অথচ অপবিত্র জীবনযাপন করে, সে কিরূপী যোগী হইবার আশা করিতে পারে?

৬. প্রত্যাহার ও ধারণা (ষষ্ঠ অধ্যায়)

সাধনার পরবর্তী সোপানকে বলা হয় ‘প্রত্যাহার’। এই প্রত্যাহার কি? তোমরা জানো কিরূপে বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়ের বাহিরের যন্ত্রগুলি, তারপর ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলি-ইহারা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শরীরের উপর কার্য করিতেছে, তারপর আছে মন। যখন এইগুলি একত্র হইয়া কোন বহির্বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত রাখা অতি কঠিন; কারণ মন (বিষয়ের) ক্রীতদাস।

আমরা জগতের সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, ‘সৎ হও, ভাল হও’। বোধ হয়, জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই, যাহাকে বলা হয় নাই, ‘মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না’ ইত্যাদি, কিন্তু কেহ তাহাকে এই-সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু কাথায় হয় না। কেন সে চোর হইবে না? আমরা তো তাহাকে চৌর্যকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি, ‘চুরি করিও না’। মন সংযত করিবার উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য করা হয়। যখন মন ইন্দ্রিয়-নামক বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, মনুষের মন ঐ কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন হইতে বাধ্য হয়। এই জন্যই মানুষ নানাপ্রকার দুষ্কর্ম করে এবং দুঃখ পায়। মন যদি নিজের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই ঐরূপ কর্ম করিত না। মন সংযত করিলে কি ফল হইত? তাহা হইলে মন আর তখন নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির কেন্দ্রগুলিতে সংযুক্ত করিবে না, ফলে অনুভব ও ইচ্ছা আমাদের বশে আসিবে। এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার বুঝা গেল। ইহা কার্যে পরিণত করা কি সম্ভব?-সর্বতোভাবে সম্ভব। তোমরা বর্তমানকালেও দেখিতে পাইতেছ-বিশ্বাস বলে আরোগ্যকারীরা রোগীকে দুঃখ, কষ্ট, অশুভ প্রভৃতি অস্বীকার করিতে শিক্ষা দেয়। অবশ্য ইহাদের যুক্তিতে সে ব্যাপারটি কতকটা ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাও একরূপ যোগ, কোনরূপে তাহারা উহা

আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্রে তাহারা দুঃখ-কষ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়া লোকের দুঃখ দূর করিতে কৃতকার্য হয়, বুঝিতে হইবে, সে-সকল ক্ষেত্রে তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কিছুটা শিক্ষা দিয়াছে, কারণ তাহারা সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়া দেয়, যাহাতে সে ইন্দিয়গুলিকে উপেক্ষা করে। সন্মোহন-বিদ্যাবিদ্‌গণও (hypnotists) প্রায় পূর্বোক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন

করিয়া ইঙ্গিত (suggestion) বলে সাময়িকভাবে রোগীর ভিতরে একপ্রকার অস্বাভাবিক প্রত্যাহারের ভাব আনয়ন করে। তথাকথিত বশীকরণ-ইঙ্গিত শুধু দুর্বল মনেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশীকরণকারী যতক্ষণ না স্থিরদৃষ্টি অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার বশ্যব্যক্তির মন নিষ্ক্রিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, ততক্ষণ তাহার ইঙ্গিত বা আদেশে কোন কাজ হয় না।

বশীকরণকারীরা বা বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারীরা যে কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের বশ্যব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্দ্রগুলি বশীভূত করিয়া থাকে, তাহা অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম, কারণ উহা ঐ বশ্যব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের পথে পর্যন্ত সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। ইহা তো স্বীয় ইচ্ছাশক্তিবলে মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রগুলির নিয়ন্ত্রণ নয়, অপরের ইচ্ছাশক্তির সহসাপ্রদত্ত আঘাতে বশ্যব্যক্তির মনকে কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করিয়া রাখা। উহা লাগাম ও পেশী-শক্তির সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল অশ্বগণের উন্মত্ত গতিকে সংযত করা নয়, বরং উহা অপরকে সেই অশ্বগণের উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়া উহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করিয়া শান্ত করিয়া রাখা। এই-সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটিতে বশ্যব্যক্তি তাহার মনের শক্তি কিছু কিছু করিয়া হারাইতে থাকে, পরিশেষে মন নিজেকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা দূরে থাক, ক্রমশঃ একপ্রকার শক্তিহীন কিম্ভূতকিমাকার জড়ে পরিণত হয়, এবং বাতুলালয়ই তাহার একমাত্র গন্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার পরিবর্তে মনকে অন্য উপায়ে বশে আনিবার চেষ্টাদ্বারা কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহা নয়, উহার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা প্রভুত্ব-জড়রস্তু ও চিন্তার দাসত্ব হইতে মুক্তি, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব। কিন্তু

সেই লক্ষ্যে না পৌঁছাইয়া, অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ইচ্ছাশক্তিপ্রবাহ, উহা যেভাবেই প্রযুক্ত হউক না কেন-সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করিয়া বা অস্বাভাবিক ভাবে জোর করিয়া ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াই হউক-পূর্ব হইতে বিদ্যমান চিন্তা ও কুসংস্কারগুলির গুরুভার শৃঙ্খলের উপর উহা আর একটি শিকলি আটকাইয়া দেয়। অতএব সাবধান, যখন অপরকে তোমার উপর যথেচ্ছ শক্তি প্রয়োগ করিতে দাও। সাবধান, যখন অপরের উপর এইরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার সর্বনাশ কর। সত্য বটে, কেহ কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের কল্যাণসাধনে কৃতকার্য হন, কিন্তু আবার চারিদিকে অজ্ঞাতসারে এই ইঙ্গিত (suggestion) শক্তি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর মধ্যে একরূপ বিকৃত, নিষ্ক্রিয় ও মোহের ভাব জাগাইয়া তুলেন, পরিণামে তাহারা আত্মার অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিস্মৃত হইয়া যায়, অতএব যে-কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, অথবা নিজের উচ্চতর ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ-শক্তিদ্বারা বহু লোককে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে বাধ্য করে, সে ইচ্ছা না করিলেও মনুষ্যজাতির অনিষ্ট করিয়া থাকে।

অতএব নিজের শরীর ও মন সংযত করিতে সর্বদাই নিজ মনের সহায়তা লইবে,

এবং সর্বদা স্মরণ রাখিবে, যে পর্যন্ত না রোগগ্রস্ত হও, ততক্ষণ বাহিরের কোন ইচ্ছাশক্তি তোমার উপর কার্য করিতে পারিবে না; আর যে কেহ তোমায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলে, সে যতই মহৎ ও ভাল হউক না কেন, তাহার সঙ্গ পরিহার করিবে। জগতের সর্বত্রই বহু সম্প্রদায় আছে-যাহাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ-নৃত্য, লম্ফ-ঝম্ফ ও চীৎকার। তাহারা যখন সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন সংক্রামক রোগের মতো লোকের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। তাহারাও একপ্রকার সন্মোহনকারী। তাঁহারা ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের উপর সাময়িকভাবে আশ্চর্য ক্ষমতা বিস্তার করে। কিন্তু হায়! পরিণামে সমগ্র জাতিকে একেবারে অধঃপতিত করিয়া দেয়। হাঁ, এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃশক্তিবলে কোন ব্যাক্তি বা জাতির পক্ষে আপাততঃ ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং মন্দ থাকাও অধিকতর সুস্থতার লক্ষণ। এই সকল দায়িত্বহীন অথচ সদুদ্দেশ্যপ্রাণোদিত

ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিগণ মানুষের যে কি পরিমাণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে যেন হৃদয় দামিয়া যায়। তাহারা জানে না যে, যে-সকল ব্যক্তি সঙ্গীত-স্তবাদির সহায়তার নিজেদের শক্তিপ্রভাবে এইরূপ সহসা ভগবদ্ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহারা কেবল নিজদিগকে নিষ্ক্রিয়, বিকৃত ও শক্তিশূন্য করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ যে-কোন ভাবের, এমন কি অসৎ ভাবেরও অধীন হইয়া পড়িবে। এই অজ্ঞ, আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিগণ স্বপ্নেও ভাবে না যে, মনুষ্যহৃদয় পরিবর্তন করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাহাদের আছে বলিয়া তাহারা যখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তখন তাহারা ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, পাপ, উন্মত্ততা ও মৃত্যুর বীজ বপন করিতেছে। তাহারা মনে করে ঐ ক্ষমতা মেঘের ওপার হইতে কোন দিব্যপুরুষ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন। অতএব যাহা কছু তোমার স্বাধীনতা নষ্ট করে, এমন সবকিছু হইতে সাবধানে থাকিবে-জানিবে উহা বিপজ্জনক, প্রাণপণ চেষ্টায় সর্বতোভাবে উহা পরিহার করিবে।

যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে অথবা সেগুলি হইতে সরাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাহারের অর্থ ‘একদিকে আহরণ’-মনের বহির্মুখী শক্তি রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের অধীনতা হইতে উহা মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ করা। ইহাতে কৃতকার্য হইলে তবেই আমরা ঠিক ঠিক চরিত্রবান্ হইব; তখনই আমরা মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব; ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যন্ত্রের মতোই জড় পদার্থ।

মনকে সংযত করা কি কঠিন! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। এক বানর ছিল, স্বভাবতই চঞ্চল-যেমন সব বানর হইয়া থাকে। যেন ঐ স্বাভাবিক অস্থিরতা যথেষ্ট ছিল না, তাই এক ব্যক্তি উহাকে অনেকটা মন্দ খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমরা অবশ্যই জানো, কাহাকেও বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে কেবল ছটফট করিয়া বেড়ায়। সুতরাং ঐ বানর-বেচারার

দুরবস্থার চূড়ান্ত হইল। পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই এক ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় বানরটির যে দুর্দমনীয় চঞ্চলতা দেখা দিল, তাহা কোন ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মনুষ্য-মন ঐ বানরের তুল্য, স্বভাবতই অবিরত ক্রিয়াশীল, আবার বাসনারূপ মদিরাপানে মত্ত হইলে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। যখন বাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন অপরের সফলতা-দর্শনে ঈর্ষারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে। শেষে আবার যখন অহঙ্কাররূপ পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে নিজেকেই বড় বলিয়া মনে করে। এইরূপ মনকে সংযত করা কি কঠিন!

অতএব মনঃসংযমের প্রথম সোপান-কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দেওয়া। মন সদা চঞ্চল। উহা সেই বানরের মতো সর্বদা লাফাইতেছে। মন-বানর যত ইচ্ছা লম্ফ-ঝম্ফ করুক ক্ষতি নাই; ধীরভাবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাও। লোকে বলে, জ্ঞানই শক্তি-ইহা অতি সত্য কথা। যতক্ষণ না জানিতে পারিবে-মন কি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে সংয়ত করিতে পারিবে না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও। অনিক বীভৎস চিন্তা হয়তো মনে উঠিবে; তোমার মনে এত অসৎ চিন্তা আসিতে পারে, ভাবিয়া তুমি আশ্চর্য হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিবে, মনের এই-সকল খেয়াল প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিতেছে। প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, তোমার মনে অসংখ্য চিন্তা আসিতেছে, ক্রমশঃ দেখিবে চিন্তা কিছুটা কমিয়াছে, আরও কয়েক মাস পরে আরও কমিয়া গিয়াছে, অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইবে; কিন্তু প্রতিদিনই আমাদিগকে ধৈর্যের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর বাষ্প থাকিবে ততক্ষণ উহা চলিবেই চলিবে; যতদিন বিষয় আমাদের সন্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় অনুভব করিতেই হইবে। সুতরাং মানুষ যে এঞ্জিনের মতো যন্ত্রমাত্র নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য দেখাইতে হইবে যে, সে কিছুরই অধীন নয়। এইরূপে মনকে সংযত করা এবং উহাকে বভিন্ন ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইতে না দেওয়াই ‘প্রত্যাহার’। ইহা

অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা খুব কঠিন কাজ, একদিনে হইবার নয়, ধৈর্যের সহিত ক্রমাগত বহু বর্ষ অভ্যাস করিলে কৃতকার্য হওয়া যায়।

কিছুকাল 'প্রত্যাহার' সাধন করিবার পর পরবর্তী সাধন অর্থাৎ 'ধারণা' অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মনকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখাই 'ধারণা'। মনকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখার অর্থ কি? ইহার অর্থ-মনকে শরীরের অন্য সকল স্থান হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন একটি বিশেষ অংশ অনুভব করিতে বাধ্য করা; উদাহরণস্বরূপ শরীরের অন্যান্য অবয়ব অনুভব না করিয়া কেবল হাতটি অনুভব করিবার চেষ্টা কর। যখন চিত্ত অর্থাৎ মন কোন নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ-সীমাবদ্ধ হয়, তখন উহাকে 'ধারণা' বলে। এই 'ধারণ' নানাবিধ। এই ধারণা-অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে

কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়ের মধ্যে এক বিন্দুর উপর মনকে 'ধারণ' করিতে হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব সহজ উপায় হৃদয়ে একটি পদ্মের চিন্তা কর, উহা যেন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়! সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তকে সহস্রদল কমল অথবা পূর্বোক্ত সুষুম্নার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে জ্যোতির্ময়রূপে চিন্তা করিবে।

যোগী প্রতিনিয়তই সাধনা অভ্যাস করিবেন। তাঁহাকে নিঃসঙ্গভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে; নানা প্রকার লোকের সঙ্গ চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে। তাঁহার বেশী কথা বলা উচিত নয়, কারন বেশী কথা বলিলে মন বিক্ষিপ্ত হয়। বেশী কাজ করাও ভাল নয়, কারণ বেশী কাজ করিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর মনঃসংযম করা যায় না। যিনি এই-সকল নিয়ম পালন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। যোগের এমনই শক্তি যে, অতি অল্পমাত্র সাধন করিলেও মহৎ ফল লাভ করা যায়। ইহাতে কাহারও অনিষ্ট হইবে না, বরং সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমতঃ স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত হইবে, মনে স্থিরতা আসিবে এবং সকল বিষয় আরও স্পষ্টভাবে দেখিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য হইবে। মেজাজ আরও ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ভাল হইবে। যোগ-অভ্যাসকালে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়, শরীরের সুস্থতা সেই প্রথম চিহ্নগুলির অন্যতম। স্বরও সুন্দর

মধুর হইবে, স্তরের দোষ বা বৈকল্য চলিয়া যাইবে; প্রথমে যে-সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, ইহা তাহাদের অন্যতম। যাঁহারা কঠোর সাধনা করেন, তাঁহাদের আরও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন দূর হইতে যেন ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দ শুনা যাইবে-যেন অনেকগুলি ঘন্টা দূরে বাজিতেছে, এবং সেইসকল শব্দ একত্র মিলিয়া কর্ণে অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ আসিতেছে। কখন কখন নানা বস্তু দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণা যেন শূন্যে ভাসিতেছে, ক্রমশ একটু একটু করিয়া বড় হইতেছে। যখন এই-সকল ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, তখন জানিও তুমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ।

যাঁহারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং দৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে যত্ন লওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাহারা অন্যান্য দৈনিক কাজের সঙ্গে অল্পস্বল্প অভ্যাস করিতে চায়, তাহাদের বেশী না খাইলেই হইল। খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা ইচ্ছামত খাইতে পারে।

যাঁহারা কঠোর সাধন করিয়া শীঘ্র উন্নতি করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। কয়েক মাস দুধ ও শস্যজাতীয় আহারই তাঁহাদের সাধন-জীবনের সহায়ক হইবে। দেহযন্ত্র উত্তরোত্তর যতই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, ততই প্রথম প্রথম দেখা যাইবে যে, অতি সামান্য অনিয়মে শরীরের ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। যতদিন পর্যন্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন আহারের সমান্য ন্যূনাধিক্য সমগ্র শরীরযন্ত্র বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে, মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর ইচ্ছামত খাইতে পারা যায়।

যখন কেহ মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করে, তখন একটি সামান্য পিন পড়িলে বোধ হইবে যেন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া বজ্র চলিয়া গেল। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি যত সূক্ষ্ম হয়, অনুভূতিও তত সূক্ষ্ম হইতে থাকে। এই-সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং যাহারা অধ্যাবসায়সহকারে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারে, তাহারাই কৃতকার্য হইবে। সর্বপ্রকার তর্ক ও যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সে-সব পরিত্যাগ কর। শুষ্ক তর্কে কি ফল? উহা কেবল সাম্যভাব নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে। সূক্ষ্মস্তরের

তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। কথায় কি তাহা হইবে? অতএব সর্বপ্রকার বৃথা বাক্য ত্যাগ কর। যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের লেখা গ্রন্থাবলী পাঠ কর।

শুক্তির ন্যায় হও। ভারতবর্ষে একটি সন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে-আকাশে যখন স্বাতীনক্ষত্র উঠিতেছে, তখন যদি বৃষ্টি হয় এবং ঐ বৃষ্টিজলের এক বিন্দু যদি কোন শুক্তির উপর পড়ে, তাহা একটি মুক্তারূপে পরিণত হয়। শুক্তিগুলি ইহা অবগত আছে; সুতরাং ঐ নক্ষত্র আকাশে উঠিলে তাহারা জলের উপর আসিয়া ঐ সময়কার একবিন্দু মহামূল্য বৃষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর পড়ে, অমনি ঐ জলকণা নিজের ভিতরে লইয়া শুক্তি মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায়; সেখানে সহিষ্ণুতাসহকারে বৃষ্টিবিন্দুকে মুক্তায় পরিণত করিবার সাধনায় মগ্ন হয়। আমাদেরও ঐরূপ করিতে হইবে। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে বহির্জগতের প্রভাব ও সর্বপ্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকাশ করিবার জন্য যত্নবান্ হইতে হইবে। শুধু নূতনত্বের জন্য একটি ভাব গ্রহণ করিয়া আর একটি নূতন ভাব পাইলে উহা ছাড়িয়া দেওয়া-এইরূপ বারংবার করিলে আমাদের শক্তি বৃথা ক্ষয় হইয়া যাইবে। সাধনকলে এইরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই সাধনা কর; উহার শেষ পর্যন্ত দেখ, উহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটি ভাব লইয়া পাগল হইয়া যাইতে পারেন, তিনিই সত্যের আলো দেখিতে পান। যাহারা এখানে একটু, ওখানে একটু আস্বাদ করিয়া বেড়ায়, তাহারা কখনই কোন বস্তু লাভ করিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের স্নায়ু একটা উত্তেজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। তাহারা চিরকাল প্রকৃতির দাস হইয়া থাকিবে, কখনই ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যাঁহারা যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রত্যেক বিষয় একটু একটু করিয়া আস্বাদ করার ভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। একটি ভাব লইয়া উহাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদা উহাই চিন্তা করিতে থাকো। ঐ ভাব অনুযায়ী জীবন যাপন কর। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এই

ভাবে পূর্ণ হইয়া যাক। অন্য সমুদয় চিন্তা দূরে থাকুক। ইহাই সিদ্ধিলাভের উপায়; এই উপায়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদ্ভব হইয়াছে। বাদ বাকী সকলে তো শুধু কথা কওয়ার যন্ত্রমাত্র। যদি আমরা নিজেরা সত্যই কৃতার্থ হইতে চাই ও অপরের জীবন ধন্য করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আরও গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রথম সোপান-মনকে কোনমতে বিক্ষিপ্ত না করা এবং যাহাদের সঙ্গে কথা বলিলে মনের চঞ্চলতা আসে, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা না করা। তোমরা সকলেই জানো যে, কতকগুলি স্থান, কোন কোন ব্যক্তি ও খাদ্য তোমাদের নিকট বিরক্তিকর। ঐগুলি এড়াইয়া চলিবে। যাহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে চায়, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। খুব দৃঢ়ভাবে সাধনা কর। মর বা বাঁচ-কিছুই গ্রাহ্য করিও না। ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। যদি খুব নির্ভীক হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে। কিন্তু যাহারা অল্পস্বল্প সাধনা করে, সব বিষয়েরই একটু আধটু চাখে, তাহারা কোনই উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফল হয় না। যাহারা তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, যাহাদের মন কোন একটি বিষয়ে কখনও স্থির হয় না, যাহারা একটু আমোদের জন্য কোন কিছু চায়, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দার্শন চিত্তবিনোদনেরই উপাদান। ইহারা সাধনে অধ্যবসায়হীন। তাহারা ধর্মকথা শুনিয়া মনে করে, বাঃ এ তো বেশ! তারপর বাড়ি গিয়া সব ভুলিয়া যায়। সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হইয়া যাইবে।' এইরূপ তেজ, এইরূপ সঙ্কল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হইবে।

৭. ধ্যান ও সমাধি (সপ্তম অধ্যায়)

এতক্ষণ আমারা রাজযোগের সূক্ষ্ম সাধনগুলি ব্যতীত বিভিন্ন সোপানসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছি। ঐ সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ সাধনগুলির উদ্দেশ্য-একাগ্রতা-সাধন। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভ করাই রাজযোগের লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যজাতির যত কিছু জ্ঞান, সেগুলি সবই সচেতন অহংবুদ্ধির। এই টেবিল ও তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমর চেতনা হইতে আমি জানি, টেবিলটি এখানে রহিয়াছে এবং তুমিও এখানে আছ। আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, আমার সত্তার অনেকটাই আমি অনুভব করিতে পারি না। শরীরের ভিতর বিভিন্ন যন্ত্র, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান নাই।

যখন আহার করি, তখন তাহা জ্ঞানপূর্বক করি; কিন্তু যখন উহা পরিপাক করি, তখন অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকি। খাদ্য যখন রক্তে পরিণত হয়, তখনও অজ্ঞাতসারেই ঐ ক্রিয়া হইয়া থাকে। আবার যখন ঐ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ শক্ত-সবল হয়, তখনও উহা আমার অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারগুলি আমাদ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। এই শরীরের মধ্যে তো আর বিশটি লোক নাই যে তাহারা ঐ কাজগুলি করিতেছে। কিন্তু কি করিয়া জানিতে পারি যে আমিই ঐগুলি করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ-বিষয়ে তো জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে, আহার ও পরিপাক করা আমার কাজ; খাদ্য হইতে শক্ত-সবল শরীর গঠন করার কাজ আমার জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে-ইহা হইতে পারে না; কারণ ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে-সকল কাজ আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, ঐগুলির প্রায় সবই সাধনবলে আমাদের চেতনভূমিতে আনা যাইতে পারে। আপাততঃ মনে হয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়, উহা নিজের গতিতে চলিতেছে। কিন্তু অভ্যাসবলে এই হৃদ্‌যন্ত্রকেও এরূপ বশে আনা যাইতে পারে যে, আমাদের ইচ্ছা অনুসারে উহা শীঘ্র বা ধীরে চলিবে, অথবা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরের প্রায় প্রত্যেক অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে পারে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যায় যে, এখন যে-

সকল ক্রিয়া অবচেতনভাবে হইতেছে, সেগুলিও আমরাই করিতেছি; তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এইমাত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্য-মন দুই স্তরে কাজ করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে সজ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে, এখানে সকল কাজ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমি করিতেছি, আর একটি ভূমির নাম নির্জ্ঞান-ভূমি (বা অজ্ঞান-ভূমি) বলা যাইতে পারে, এখানকার কাজের সহিত 'আমি'-বোধ থাকে না।

আমাদের মানস কার্যকলাপের যে অংশে 'অহং'ভাব থাকে না, তাহা অজ্ঞানভূমির ক্রিয়া, আর যে অংশে অহংভাব থাকে, তাহা জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া। নিম্নজাতীয় জীবজন্তুতে এই অজ্ঞানভূমির কার্যগুলিকে সহজাতবৃত্তি (instinct) বলে। উচ্চতর জীবে ও উচ্চতম জীব মনুষ্যে জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াই প্রবল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর ভূমিতে মন কার্য করিতে পারে। মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। অজ্ঞানভূমিতে কৃত কার্য যেমন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে ঘটে, ঠিক সেইরূপ আর এক প্রকার কাজ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে হইয়া থাকে। উহাতেও কোনরূপ অহংভাব থাকে না। এই অহংবুদ্ধি কেবল মধ্যস্তরেই থাকে। উহাতেও কোনরূপ অহংভাব থাকে না। এই অহংবুদ্ধি কেবল মধ্যস্তরেই থাকে। যখন মন এই স্তরের ঊর্ধ্বে বা নিম্নে থাকে, তখন আমি-রূপ কোন বোধ থাকে না, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। যখন মন এই অহংবোধের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন তাহাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বলে। সমাধি-অবস্থায় মানুষ সজ্ঞানভূমির নিম্নস্তরে চলিয়া যায় নাই, অবনত হইয়া যায় নাই-ইহা আমারা কেমন করিয়া জানিব? এই দুই অবস্থার কাজই অহংভাবশূন্য। ইহার উত্তর এই-ফল দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে, কে সজ্ঞানভূমির নিম্নে আর কেই বা ঊর্ধ্বে। যখন কেহ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়, সে তখন সজ্ঞানভূমির নিম্নে অবচেতন ভূমিতে চলিয়া যায়। তখনও তাহার শরীরের সমুদয় ক্রিয়া চলিতে থাকে, সে শ্বাসপ্রশ্বাস লয়, এমন কি নিদ্রার মধ্যে শরীর সঞ্চালনও করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার এইসকল কার্যে অহংভাবের কোন সংস্রব থাকে না, তখন তাহার চেতনা থাকে না; নিদ্রা হইতে যখন উত্থিত হয়, তখন সে যে-মানুষ ছিল, সেই মানুষই থাকিয়া যায়। নিদ্রা

যাইবার পূর্বে তাহার যতখানি জ্ঞান ছিল, নিদ্রাভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই থাকে; উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। তাহার হৃদয় কোন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়-মূর্খও যদি সমাধিস্থ হয়-সমাধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিয়া আসে।

এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থা হইতে মানুষ যেমন গিয়াছিল, সেইরূপই ফিরিয়া আসিল; আর এক অবস্থা হইতে মানুষ জ্ঞানী হইয়া ফিরিল-এক সাধু-মহাপুরুষে পরিণত হইল, তাহারা স্বভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহার জীবনও রূপান্তরিত হইয়া গেল, সে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল। এই তো দুই অবস্থার বিভিন্ন ফল! ফল যখন ভিন্ন,তখন কারণও অবশ্যই ভিন্ন হইবে। সমাধিঅবস্থায় লব্ধ এই জ্ঞানালোক যেহেতু নির্জ্ঞান-অবস্থার অনুভূতি অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, বা জ্ঞানভূমিতে যুক্তিবিচারলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অনেক উচ্চতর, তখন উহা অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে আসিতেছে। সেইজন্যই সমাধি ‘জ্ঞানাতীত অবস্থা’ নামে অভিহিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে ইহাই সমাধিতত্ত্ব। এই সমাধির কার্যকারিতা কি? এখানেই ইহার কার্যকারিতা। আমরা জ্ঞাতসারে যে-সকল কর্ম করিয়া থাকি, যাহাকে বিচারবুদ্ধির

ক্ষেত্র বলা যায়, তাহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই মানুষের বিচারবুদ্ধি নড়াচড়া করিতে বাধ্য, তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। উহার বাহিরে যাইবার সামান্য চেষ্টাও অসম্ভব। অথচ মানুষ যাহা অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহা ঐ যুক্তিবিচারের বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কিনা, ঈশ্বর আছেন কিনা, এই জগতের নিয়ন্তা পরমচৈতন্যস্বরূপ কেহ আছেন কিনা এ-সকল প্রশ্ন যুক্তির এলাকার বাহিরে। যুক্তি কখনও এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। যুক্তি কি বলে? যুক্তি বলেঃ আমি অজ্ঞেয়বাদী, আমি ‘হাঁ’ বা ‘না’ কিছুই জানি না। কিন্তু এই প্রশ্নগুলি আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর না পাইলে মানবজীবন উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়ে। আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সর্ববিধ মনোভাব, মনুষ্য-স্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও ভাল, সে-সবই যুক্তিরাজ্যের বাহির হইতে যে উত্তর আসে, তাহা দ্বারা গঠিত হয়।

অতএব, এই-সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। জীবন যদি শুধু একটি নাটিকা হয়, বিশ্বজগৎ যদি কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক মিলনমাত্র হয়, তাহা হইলে অপরের উপকার কেন করিব? দয়া, ন্যায়পরতা অথবা সহানুভূতির প্রয়োজন কি? তবে তো সময় থাকিতে কাজ গুছাইয়া লও-এই নীতিই এ পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট হইত। যদি আশাই না থাকে, তবে আমি আমার ভ্রাতার গলা না কটিয়া তাহাকে ভালবাসিব কেন? যদি সমুদয় জগতের অতীত কোন সত্তা না থাকে, যদি মুক্তি বলিয়া কিছু না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর প্রাণহীন নিয়মেই সব হইয়া পড়ে, তবে তো যাহাতে ইহলোকে সুখী হইতে পারি, শুধু তাহারি চেষ্টা করিব। আজকাল দেখা যায় অনেকে বলে, তাহাদের নীতির ভিত্তি হিতবাদ (Utility)। এই নীতির ভিত্তি কি? সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা-কেন এরূপ করিব? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব না কেন? হিতবাদিগণ (Utilitarians) এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, তাহা তুমি কি করিয়া জানিবে? আমি আমার সুখের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহার তৃপ্তিসাধন করিলাম, উহা আমার স্বভার, উহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না। আমার এইসব বাসনা আছে, আমি এগুলি পূর্ণ করিব, তোমার আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে? নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহানুভূতি, সাধুত্ব ও সর্বোপরি নিঃস্বার্থতা-মনুষ্যজীবনের এই-সকল ভাব ও মহৎ সত্যগুলি কোথা হইতে আসিল?

সমুদয় নীতি-শাস্ত্র, মানুষের সকল কাজকর্ম ও চিন্তা এই নিঃস্বার্থতারূপ একটি মাত্র ভাবের উপর নির্ভর করে, মানবজীবনের সমুদয় ভাব 'নিঃস্বার্থতা', এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। কেন আমরা স্বার্থশূন্য হইব? নিঃস্বার্থ হইবার প্রয়োজনীয়তা কি? শক্তি ও প্রেরণাই বা কোথায়? তুমি নিজেকে যুক্তিবাদী -হিতবাদী বলিয়া থাকো; কিন্তু তুমি যদি হিতসাধন করিবার যুক্তি দেখাইতে না পারো, তাহা হইলে আমি তোমাকে অযৌক্তিক বলিব। আমি কেন স্বার্থপর হইব না,

তাহার যুক্তি দেখাও। অবশ্য কবিত্ব হিসাবে নিঃস্বার্থতা অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তো যুক্তি নয়। আমাকে যুক্তি দেখাও-কেন আমি নিঃস্বার্থ হইব, কেন আমি সৎ হইব? অমুক এই কথা বলে-এরূপ কথার কোন মূল্য আমার কাছে নাই। আমার নিঃস্বার্থ হওয়ার উপযোগিতা কোথায়? 'হিত' বলিতে যদি 'অধিকতম সুখ' বুঝায়, তবে স্বার্থপর হইলেই আমার পক্ষে হিত। ইহার কি উত্তর? হিতবাদিগণ ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না। ইহার উত্তর-এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অনন্ত সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু, অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র শিকলি। যাঁহারা নিঃস্বার্থতা প্রচার করিয়াছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? আমরা জানি, ইহা সহজাত বৃত্তি নয়। সহজাত-জ্ঞানসম্পন্ন পশুগণ ইহা জানে না, বিচার বুদ্ধিতেও ইহা পাওয়া যায় না, যুক্তিদ্বারা এই-সকল তত্ত্বের কিছুমাত্র জানা যায় না। তবে ঐ-সকল তত্ত্ব কোথা হইতে আসিল?

ইতিহাস-পাঠে দেখিতে পাই, জগতের মহান্ ধর্মাচার্যগণ সকলই একটি তথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, জগতের বাহির হইতে তাঁহারা এই সত্য লাভ করিয়াছেন, তবে তাঁহারা অনেকেই জানেন না, এই সত্য ঠিক কোথা হইতে পাইয়াছেন। কেহ হয়তো বলিলেন, এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত মনুষ্যাকারে আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'ওহে মানব, শোন, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর।' দ্বিতীয় ব্যাক্তি বলিলেন, এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁহার সন্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন, স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার পিতৃপরুষ আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই জানেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্ত্বলাভের কথা বলিলেও ইঁহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন নাই, উহার অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা উহা লাভ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে যোগশাস্ত্র কি বলে? যোগশাস্ত্র বলে, যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা যে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ-কথা ঠিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান আসিয়াছে।

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চতর অবস্থা আছে, যাহা যুক্তিবিচারের ঊর্ধ্বে-জ্ঞানাতীত অবস্থা। এই উচ্চাবস্থায় পৌঁছিলে মানব তর্কের অতীত এই এই জ্ঞান লাভ করে-বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করে। যুক্তবিচারের অতীত অবস্থা লাভ করা, সধারণ মানবীয় স্বভাব অতিক্রম করা-কখন কখন মানুষের জীবনে অতর্কিতে সম্ভব হইতে পারে, সে ব্যক্তি এ ঘটনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে; সে যেন হঠাৎ এই জ্ঞান লাভ করে; ঐরূপে হঠাৎ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানলাভ হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে যে, ঐ জ্ঞান বাহির হইতে আসিয়াছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই দিব্যপ্রেরণা-পারমার্থিক জ্ঞান বিভিন্ন দেশে একই প্রকারের হইতে পারে; কোন দেশে মনে হইবে দেবদূত হইতে আসিয়াছে, কোন দেশে দেববিশেষ হইতে, আবার কোথাও বা সাক্ষাৎ ভগবান্ হইতে পাপ্ত বলিয়া মনে হইতে

পারে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ মন নিজ স্বভাব অনুয়ায়ী নিজের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যিনি উহা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজ শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুসারে ঐ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইঁহারা সকলেই ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন।

যোগীরা বলেন, এই অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় এক ঘোর বিপদের আশঙ্কা আছে। অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখিবে, যে-সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝেন নাই, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত সাধারণতঃ কিছু না কিছু কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিয়া যায়। তাঁহারা অনেক অলীক দৃশ্য দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন।

* * *

যাহা ইউক, আমরা অনেক মহাপুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, সমাধিলাভের পথে পূর্বোক্তরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই

তাঁহারা সকলেই দিব্য প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-কোন ভাবেই হউক, ঐ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-কোন ভাবেই হউক, ঐ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। যখনই কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবোচ্ছ্বাসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছুটা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি তাঁহাতে দেখা দিয়াছে। তাঁহার শিক্ষার মহত্ত্ব দ্বারা যেমন জগতের উপকার হইয়াছে, ঐ কুসংস্কারাদির দ্বারা তেমনি ক্ষতিও হইয়াছে। অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনুষ্যজীবনে কিছু সামঞ্জস্য ও যুক্তি দেখিতে হইলে আমাদিগকে সাধারণ যুক্তির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, কিন্তু উহা বৈজ্ঞানিকভাবে ধীরে ধীরে নিয়মিত সাধনাদ্বারা করিতে হইবে এবং সমুদয় কুসংস্কার বিসর্জন দিতে হইব। অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, সমাধিতত্ত্বশিক্ষার সময় ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। যুক্তির উপরই আমাদের ভিত্তিস্থাপন করিতে হইবে, যুক্তি আমাদিগকে যতদূর লইয়া যায় ততদূর যাইতে হইবে; যুক্তি যখন আর চলিবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ দেখাইয়া দিবে। অতএব যখন শুনিবে কেহ বলিতেছে, 'অমি প্রত্যাদিষ্ট', অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছে, তাহার কথা শুনিও না। কেন? কারণ এই তিন অবস্থা-সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা অথবা নির্জ্ঞান, সজ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা- একই মনের অবস্থাবিশেষ। একই ব্যক্তির তিনটি মন নাই, কিন্তু মনের একটি অবস্থা অপরগুলিতে পরিণত হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচারপূর্বক-জ্ঞানে ও বিচারপূর্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত আবস্থায় পরিণত হয়; সুতরাং অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী নয়। প্রকৃত প্রেরণা যুক্তিবিরোধী নয়-বরং যুক্তির পূর্ণতা সাধন করে। ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ যেমন বলিয়াছেন, 'আমি ধ্বংস করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ

করিতে আসিয়াছি-'সেইরূপ প্রেরণাও যুক্তিকে পরিপূর্ন করে, যুক্তির সহিত উহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদিগকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্যই যোগের বিভিন্ন সোপানগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু এটি বুঝা বিশেষ আবশ্যক যে,

এই অতীন্দ্রিয় প্রেরণালাভের শক্তি প্রাচীন মহাপুরুষগণের ন্যায় প্রত্যেক মানুষের স্বভাবেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণ পৃথক্-অতুলনীয় কিছু ছিলেন না, তাঁহারা তোমার আমার মতোই মানুষ ছিলেন। তাঁহারা উচ্চঙ্গের যোগী ছিলেন এবং এই জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। চেষ্টা করিলে তুমি-আমিও উহা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা কোন বিশেষ-প্রকারের অদ্ভূত লোক ছিলেন না। একজন ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন- এই ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যাক্তির পক্ষেই ঐ অবস্থা লাভ করা সম্ভব। ইহা যে শুধু সম্ভব তাহা নয়, সকলকেই কালে ঐ অবস্থা লাভ করিতে হইবে, এবং ইহাই ধর্ম। অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক। আমরা সারা জীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্তু নিজেরা প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্র বুঝিতে পারিব না। কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে দিয়া তুমি কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়া তুলিবার আশা করিতে পার না। একখানি মানচিত্র দেখাইয়া আমার দেশ দেখিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পার না। একখানি মানচিত্র দেখাইয়া আমার দেশ দেখিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পার না। আমাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে। মানচিত্র কেবল অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মূল্য নাই। শুধু পুস্তকের উপর নির্ভরতা মানুষের মনকে অবনতির দিকেই লইয়া যায়। ঈশ্বরীয় জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা ঐ শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ-এরূপ বলা অপেক্ষা ঘোরতর ঈশ্বরনিন্দা আর কি হইতে পারে? মানুষ ভগবান্‌কে অনন্ত বলে, আবার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের গন্ডিতে তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে চায়!-কি তাহার স্পর্ধা! কোন বিশেষ ধর্মগ্রন্থে যাহা আছে, তাহা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া, ‘একখানি গ্রন্থের মধ্যে সমুদয় ঈশ্বরীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ’-ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। অবশ্য এই নিধনের ও হত্যার যুগ এখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জগৎ এখনও ধর্মগ্রন্থে অন্ধবিশ্বাস দ্বারা দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে তোমাদিগকে রাজযোগবিষয়ে যে-সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার বিভিন্ন সোপান দিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যাহার ও ধারণার পর, এখন ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিব। দেহের ভিতরে বা

বাহিরে কোন স্থানে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাখিতে পারিলে মন অবিচ্ছিন্ন গতিতে ঐ দিকে প্রবাহিত হইবার শক্তি লাভ করিবে। এই অবস্থার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় যে, সাধক অনুভবের বহির্ভাগ বর্জন করিয়া শুধু উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ অর্থের ধ্যানই করেন, তখন সেই অবস্থায় নাম 'সমাধি'। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-এই তিনটিকে একত্র 'সংযম' বলে; অর্থাৎ প্রথমতঃ যদি কেহ কোন

বস্তুর উপর মন একাগ্র করিতে পারে, পরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ একাগ্রতার ভাব রক্ষা করিতে পারে, অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা দ্বারা, যে অভ্যন্তরীণ কারণ হইতে ঐ বাহ্য বস্তুর অনুভূতি উৎপন্ন হইয়াছে, যদি শুধু তাহারই উপর মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে সবকিছুই এইরূপ মনের বশীভূত হইয়া যায়।

এই ধ্যানাবস্থাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা। যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ যথার্থ সুখ সম্ভব নয়, কেবল ধ্যানভাবে সাক্ষিরূপে সবকিছু পর্যালোচনা করিতে পারিলেই আমাদের প্রকৃত সুখ ও আনন্দ লাভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন। যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থা লাভ করিয়ছেন, তাঁহার নিকটই জগৎ যথার্থ সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়। যাঁহার বাসনা নাই, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে লিপ্ত করেন না, তাঁহার নিকট প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবর্তন সুন্দর ও মহান্ ভাবের এক অফুরন্ত চিত্রপট!

ধ্যানে এই তত্ত্বগুলি বুঝিতে হইবে। মনে কর, একটি শব্দ শুনিলাম। প্রথমে বাহিরে একটি কম্পন উঠিল, তারপর স্নায়বীয় গতি উহাকে মনের কাছে লইয়া গেল, পরে মন হইতে এক প্রতিক্রিয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উদিত হইল; এই বাহ্যবস্তুটিই ইথারে কম্পন হইতে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনগুলির কারণ। যোগশাস্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় ঐগুলিকে ইথারের কম্পন, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বলা হয়। এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ঐগুলির প্রভেদ অতি অস্পষ্ট। বাস্তবিক আমরা এখন ঐ তিনটির কোনটিকেই অনুভব করিতে পারি না,

উহাদের সন্মিলিত ফল অনুভব করি এবং সেটিকেই বাহ্যবস্তু বলি। প্রত্যেক অনুভবক্রিয়াতেই এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে; উহাদিগকে পৃথক্ করিতে না পারার কোন কারণ নাই।

প্রাথমিক প্রস্তুতি দ্বারা যখন মন দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সূক্ষ্মতর অনুভবের শক্তি লাভ করে, তখন উহাকে ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্তব্য। প্রথমতঃ স্থূল বস্তু লইয়া ধ্যান করিতে হইবে। পরে ক্রমশঃ ধ্যান সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, শেষে বিষয়শূন্য ধ্যানে পরিণত হইবে। মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি, পরে স্নায়ুমাধ্যস্থ গতি, তারপর নিজের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুভব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। মন যখন বেদনা বা অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি পৃথক্ভাবে জানিতে পারিবে, তখন মনের সমুদয় সূক্ষ্ম-জড় পদার্থ, সমুদয় সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্মরূপ অনুভব করিবার ক্ষমতা হইবে। মন যখন অভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে পৃথক্ভাবে জানিতে পারিবে, তখন নিজের ও অপরের মানসিক তরঙ্গগুলি জড়-শক্তিরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই মন ঐগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে। যখন মন মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে পৃথকভাবে অনুভব করিবে, তখন যোগী সবকিছুর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন; কারণ অনুভবযোগ্য প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি চিন্তা এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার

ফল। এরূপ অবস্থালাভ হইলে যোগী নিজ মনের ভিত্তি পর্যন্ত অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিবে। যোগীর তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তিলাভ হয়; যদি তিনি এই সকল শক্তির কোন একটি দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হইলে এই অনিষ্ট হয়। কিন্তু যদি এই-সকল অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে, তবে তিনি মন-সমুদ্রে বৃত্তি-তরঙ্গ সম্পূর্ণ নিরোধ-করা-রূপ যোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন। তখনই মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ শরীরের নানাবিধ গতি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আত্মার মহিমা নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে। তখন যোগী তাঁহার শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, বুঝিবেন-তিনি জ্ঞানঘন, অবিনাশী ও সর্বব্যাপী।

এই সমাধিতে প্রত্যেক মানুষের, এমন কি প্রত্যেক প্রাণীর অধিকার আছে। নিম্নতর জীবজন্তু হইতে উচ্চতম দেবতা পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন সময়ে এই অবস্থা লাভ করিবে; যাহার যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই তাহার প্রকৃত 'ধর্ম' আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা শুধু ঐ অবস্থার দিকে যাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছি। যাহাদের কোন 'ধর্ম' নাই, তাহাদের সহিত আমাদের এখন কোন প্রভেদ নাই, কারণ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদেরও কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপনীত করা ব্যতীত এই একাগ্রতা-সাধনের কি প্রয়োজন? এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেকটি সাধন-সোপান যুক্তিপূর্বক বিচার করা হইয়াছে, যথাযথভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। যদি ঠিক ঠিক সাধন করা হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবে। তখন সমুদয় দুঃখ চলিয়া যাইবে, সকল যন্ত্রণা অন্তর্হিত হইবে, কর্মবীজ দগ্ধ হইয়া যাইবে, আত্মাও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে।

৮. সংক্ষেপে রাজযোগ (অষ্টম অধ্যায়)

কূর্মপুরাণ১ হইতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করিয়া রাজযোগের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যোগাগ্নি মানবের পাপ-পিঞ্জরকে দগ্ধ করে; তখন চিত্তশুদ্ধি হয়, সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়, জ্ঞানও আবার যোগীকে সাহায্য করে। যাঁহার মধ্যে যোগ ও জ্ঞান সমন্বিত, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন। যাঁহারা প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সদাসর্বদা 'মহাযোগ' অভ্যাস করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে। যোগ দুই প্রকার-একটির বলে অভাব, অন্যটি মহাযোগ। যখন নিজেকে শূন্য ও সর্বপ্রকার গুণবিরহিতরূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে 'অভাবযোগ' বলে। যে যোগে আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে চিন্তা করা হয়, তাহাকে 'মহাযোগ' বলে। যোগী প্রত্যেকটি দ্বারাই আত্মসাক্ষৎকার করেন। আমরা অন্যান্য যে-সব যোগের কথা শাস্ত্রে পাঠ করি বা শুনিতে পাই, সে-সব যোগ এই মহাযোগের সমশ্রেণীভূক্ত হইতে পারে না। এই মহাযোগে যোগী নিজেকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে অনুভব করেন। ইহাই সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

রাজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে-যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। উহাদের মধ্যে 'যম' বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। এই যম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কায় মন ও বাক্য দ্বারা কখনও কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করাকে 'অহিংসা' বলে। অহিংসা অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাভাব হইতে মানুষ যে সুখ লাভ করে, তদপেক্ষা উচ্চতর সুখ আর নাই। সত্যে দ্বারাই আমরা কর্মের ফল লাভ করি, সত্যের ভিতর দিয়াই সবকিছু পাওয়া যায়। সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ কথনকেই 'সত্য' বলে। চৌর্য বা বলপূর্বক অপরের বস্তু গ্রহণ না করার নাম 'অস্তেয়'। কায়মনোবাক্যে সর্বদা সকল অবস্থায় পবিত্রতা রক্ষা করার নামই 'ব্রহ্মচর্য'। অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না করাকে 'অপরিগ্রহ' বলে। অপরিগ্রহ-সাধনের উদ্দেশ্য এই-কাহারও নিকট কিছু

লইলে হৃদয় অপবিত্র হইয়া যায়; গ্রহীতা হীন হইয়া যান, নিজের স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলেন, এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়েন।

তপঃ স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান-এই কয়েকটিকে 'নিয়ম' বলে। নিয়ম-শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত-পালন। উপবাস বা অন্য উপায়ে দেহসংযমকে 'শারীরিক তপস্যা' বলে।

১ কূর্মপুরাণ উপবিভাগ-একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেদপাঠ অথবা অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ, যাহা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হয়, তাহাকে 'স্বাধ্যায়' বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে-বাচিক, উপাংশ ও মানস। বাচিক জপ সর্বনিম্নে এবং মানস জপ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে জপ এত উচ্চস্বরে করা হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে 'বাচিক' বলে। যে জপে কেবল ওষ্ঠে স্পন্দনমাত্র হয়, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না, তাহাকে 'উপাংশ' বলে। যে মন্ত্রজপে কোন শব্দ শোনা যায় না, জপ করার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয়, তাহাকে 'মানস জপ' বলে। উহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ বলিয়াছেন, শৌচ দ্বিবিধ-বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে 'বাহ্য শৌচ' বলে; যথা স্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মানুশীলন দ্বারা মনের শুদ্ধিকে 'আভ্যন্তর শৌচ' বলে। বাহ্য ও আভ্যন্তর-উভয় শুদ্ধিই আবশ্যক। কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়া বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ যথেষ্ট হইল না। যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ-অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না।

ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ ভক্তির নাম 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল। তারপর 'আসন'। আসন-সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, বক্ষঃস্থল গ্রীবা ও মস্তক সমান রাখিয়া শরীরটিকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে হইবে। অতঃপর প্রাণায়াম। 'প্রাণ' শব্দের অর্থ-নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, এবং 'আয়াম' শব্দের অর্থ-উহার সংযম বা নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়াম তিন প্রকার-অধম, মধ্যম ও উত্তম। প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত-

পূরক, কুম্ভক ও রেচক। যে প্রাণায়ামে ১২ সেকেন্ড কাল বায়ু পূরণ করা যায়, তাহাকে ‘অধম প্রাণায়াম’ বলে। ২৪ সেকেন্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে ‘মধ্যম প্রাণায়াম’ ও ৩৬ সেকেন্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে তাহাকে ‘উত্তম প্রাণায়াম’ বলে। অধম প্রাণায়ামে ঘর্ম ও মধ্যম প্রাণায়ামে কম্পন হয়; উত্তম প্রাণায়ামে শরীর লঘু হইয়া আসন হইতে উত্থিত হয় এবং ভিতরে পরম আনন্দ অনুভূত হয়।

গায়ত্রী নামে একটি মন্ত্র আছে, উহা বেদের অতি পবিত্র মন্ত্র। উহার অর্থঃ ‘ আমরা এই জগতের প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীশক্তি জাগ্রত করিয়া দিন’। এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত আছে। একটি প্রাণায়ামের সময় মনে মনে তিনবার গায়ত্রী উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে, যথা-রেচক (বাহিরে শ্বাসত্যাগ), পূরক (শ্বাসগ্রহণ) ও কুম্ভক (ভিতরে ধারণ করা, সুস্থির রাখা)। অনুভূতির যন্ত্র ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ হইয়া কার্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসিতেছে। ঐগুলিকে ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে আনাকে ‘প্রত্যাহার’ বলে, অথবা নিজের দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করাই প্রত্যাহার-শব্দের অর্থ।

হৃদ্-পদ্মে, মস্তকের কেন্দে বা দেহের অন্য স্থানে মনকে স্থির করার নাম ‘ধারণা’ ।

মনকে এক স্থানে সংলগ্ন করিয়া, সেই স্থানটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া এক বিশেষ প্রকার বৃত্তিতরঙ্গ উত্থিত করা যাইতে পারে। অন্য প্রকার তরঙ্গ এগুলিকে গ্রাস করিতে পারে না, পরন্তু ধীরে ধীরে এগুলিই প্রবল হয়। অন্যগুলি দূরে সরিয়া যায়-শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। অবশেষে এই বহু-বৃত্তিরও নাশ হইয়া একটি মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে; ইহাকে ‘ধ্যান’ বলে। যখন কোন অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না, সমুদয় মনটিই যখন একটি তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, মনের সেই একরূপতার নাম ‘সমাধি’। তখন আর কোন বিশেষ স্থান ও কেন্দ্রের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; সেগুলির সাহায্য ব্যতীতই তখন কেবল ধ্যেয় বস্তুর ভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদি মনকে কোন কেন্দ্রে ১২ সেকেন্ড স্থির করা যায়, তাহাতে একটি ‘ধারণা’ হইবে; এইরূপ ১২টি ধারণা হইলে একটি ‘ধ্যান’ এবং এই ধ্যান দ্বাদশ গুণ হইলে একটি ‘সমাধি’ হইবে।

যেখানে অগ্নি আছে, জলে, শুষ্কপত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বল্মীকপূর্ণ স্থানে, বণ্যজন্তুসমাকুল বনে, যেখানে বিপদাশঙ্কা আছে এমন স্থানে, চতুষ্পথে, অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অথবা যেখানে বহু দুর্জনের বাস, সে-স্থানে যোগ সাধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য। যখন শরীর অতিশয় ক্লান্ত বা অসুস্থ বোধ হয়, অথবা মন যখন অতিশয় দুঃখপূর্ণ ও বিষণ্ণ থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি সুগুপ্ত ও নির্জন স্থানে, যেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে আসিবে না, এমন স্থানে গিয়া সাধন কর। অশুচি স্থান নির্বাচন করিও না, বরং সুন্দর দৃশ্যযুক্ত স্থানে অথবা তোমার নিজগৃহে একটি সুন্দর ঘরে বসিয়া সাধন করিবে। প্রথমেই প্রাচীন যোগিগণকে, তোমার নিজ গুরু ও ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কতকগুলি ধ্যানের প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। ঠিক সরলভাবে উপবেশন করিয়া নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখো। ক্রমশঃ আমরা জানিব, কিভাবে ইহাদ্বারা মন একাগ্র হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমিকেও অনেকটা আয়ত্তে আনা যায়, এইভাবে উহাদ্বারা ইচ্ছাশক্তিও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এইবার কয়েকপ্রকার ধ্যানের কথা বলা যাইতেছে। কল্পনা কর, মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে একটি পদ্ম রহিয়াছে, ধর্ম উহার কেন্দ্র, জ্ঞান উহার মৃণাল, যোগীর অষ্টসিদ্ধি ঐ পদ্মের অষ্টদল, আর বৈরাগ্য উহার অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকা। যদি যোগী বাহিরের শক্তি (অষ্টসিদ্ধি) পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বাহিরের অষ্টদলরুপে এবং অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধিতেও 'বৈরাগ্য'-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পদ্মের অভ্যন্তরস্থ কর্ণিকাকে পর-বৈরাগ্য অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধিতেও 'বৈরাগ্য'-রূপে বর্ণনা করা হইল। এই পদ্মের অভ্যন্তরে-হিরন্ময়, সর্বশক্তিমান্, অস্পর্শ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, জ্যোতির্মন্ডলমধ্যবর্তী পুরুষকে ধ্যান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে। চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, আর ঐ আকাশের মধ্যে একটি অগ্নিশিখা

জ্বলিতেছে; ঐ শিখাকে নিজ আত্মারূপে চিন্তা কর, আবার ঐ শিখার অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতির্ময় আলোকের চিন্তা কর; উহা তোমার আত্মার আত্মা-পরমাত্মা, ঈশ্বর। হৃদয়ে এই ভাবটি ধ্যান কর। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা অর্থাৎ সকলকে-এমন কি মহাশত্রুকেও ক্ষমা করা, সত্য, আস্তিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্রতস্বরূপ। ইহাদের সবগুলিতেই যদি তুমি সিদ্ধ হইতে না পারো, তাহা হইলে দুঃখিত বা ভীত হইও না। চেষ্টা কর, ধীরে ধীরে সবই আসিবে। বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক যিনি ভগবানে তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহারই শরণাগত হইয়াছেন, যাঁহার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যাহা কিছু চান, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া দেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞান, ভক্তি অথবা বৈরাগ্যযোগে উপাসনা কর।

‘যিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যাঁহার নিজস্ব বলিতে কিছু নাই, যিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ধৈর্যশীল, যিনি অহংকারমুক্ত হইয়াছেন, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যিনি সর্বদাই যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করেন, যতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয়, যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকসমূহ হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্ষ, ক্রোধ, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি কোন কিছুর উপর নির্ভর করেন না, যিনি শুচি, দক্ষ, সুখদুঃখে উদাসীন, যাঁহার দুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি-নিজের জন্য সকল কর্মচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছু পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহশূন্য-যাঁহার নির্দিষ্ট কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগৎই যাঁহার গৃহ, যাঁহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই আমার ভক্ত, এইরূপ ব্যাক্তিই যোগী হইতে পারেন।’ ১

****

নারদ নামে এক মহান্ দেবর্ষি ছিলেন। যেমন মানুষের মধ্যে ঋষি অর্থাৎ বড় বড় যোগী থাকেন, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী আছেন। নারদও সেইরূপ একজন

মহাযোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি এক বনের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সেখানে দেখিলেন একজন লোক ধ্যান করিতেছে; সে এত গভীরভাবে ধ্যান করিতেছে, এত দীর্ঘকাল একাসনে উপবিষ্ট আছে যে, তাহার চতুর্দিকে প্রকান্ড বল্মীক-স্তুপ নির্মিত হইয়া গিয়াছে। সে নারদকে বলিল, 'প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন?' নারদ উত্তর করিলেন, 'বৈকুণ্ঠে যাইতেছি।' তখন সে বলিল, 'ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি কবে আমায় কৃপা করিবেন, কবে আমি মুক্তকলাভ করিব।' আরও কিছুদূর যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। সে ব্যক্তি লম্ফ-ঝম্ফ নৃত্য-গীতাদি করিতেছিল, সেও বলিল, 'ও নারদ, কোথায় চলেছ?' তার কণ্ঠস্বর ও ভাব-ভঙ্গি পাগলের মতো। নারদ তাহাকেও বলেলেন, 'স্বর্গে যাইতেছি।' সে বলিল, 'তা-হ'লে ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কবে মুক্ত হবো।'

নারদ চলিয়া গেলেন। কালক্রমে নারদ আবার সেই পথে যাইবার সময় বল্মীক-স্তূপ মধ্যে ধ্যানস্থ সেই যোগীকে দেখিতে পাইলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবর্ষে, আপনি কি আমার কাথা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?' 'হাঁ, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।' 'তিনি কি বলিলেন?' নারদ উত্তর দিলেন, 'ভগবান্ বলিলেন-মুক্তি পাইতে তোমার আরও চার জন্ম লাগিবে।' তখন সেই ব্যক্তি বিলাপ ও আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে বল্মীক-স্তূপ হইয়া গিয়াছে, এখনও আমার চার জন্ম অবশিষ্ট!' নারদ তখন অপর ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?' নারদ বলিলেন, 'হাঁ, এই তোমার সন্মুখে তেঁতুল গাছ দেখিতেছ? এই গাছে যত পাতা আছে, তোমাকে ততবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তবে তুমি মুক্তিলাভ করিবে।' এই কথা শুনিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, 'এত অল্প সময়ে মুক্তিলাভ ক'রব!' তখন এক দৈববাণী হইল, 'বৎস, তুমি এই মুহূর্তে মুক্তিলাভ করিবে।' সে ব্যাক্তি এইরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার ঐ পুরস্কারলাভ হইল। সে ব্যক্তি বহু জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুই তাহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐ প্রথম ব্যক্তি চার জন্মকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। যে

ব্যক্তি মুক্তির জন্য শত শত যুগ অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল, তাহার ন্যায় অধ্যবসায়সম্পন্ন হইলেই উচ্চতম ফললাভ হইয়া থাকে।